

পুঁজিবাদের মৃত্যুযন্ত্রণা ও চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কাজ

অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচি - লিও ট্রটস্কি (১৯৩৮)

অনুবাদ: নিজার মাহুজ নির্ভার

[বিঃদ্র: অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচি লেখাটি প্রথমত রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান অনুবাদটি ইংরেজি ভাষা থেকে অনুবাদিত এবং একটি অনুবাদের অনুবাদ। অতএব মূল অর্থ ধরে রাখার চেষ্টা করা হলেও অর্থের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কোন ভুল পেয়ে থাকলে nirjhorm@marxists.org তে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো]

প্রথম ভাগ

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বস্তুগত পূর্বশর্ত

সামগ্রিকভাবে বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য মজদুর শ্রেণির নেতৃত্বের ঐতিহাসিক সংকট।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত সাধারণভাবে ইতিমধ্যেই পরিপক্বতার সেই চূড়ায় পৌঁছে গেছে, পুঁজিবাদের অধীনে যার চেয়ে উঁচুতে ওঠা সম্ভব নয়। মানবজাতির উৎপাদিকা শক্তি থমকে আছে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উন্নতি এখন আর বস্তুগত সম্পদের স্তর বাড়াতে ব্যর্থ হচ্ছে। গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক সংকটের পরিস্থিতিতে বাজারচক্রের সংকটগুলো জনগণের ওপর ক্রমেই আরও ভারী বঞ্চনা ও দুর্ভোগ চাপিয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব আবার রাষ্ট্রের আর্থিক সংকটকে গভীর করছে এবং টলমলে মুদ্রাব্যবস্থার ভিত নড়িয়ে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা উভয়েই এক দেউলিয়াত্ব থেকে আরেক দেউলিয়াত্বের দিকে টলতে টলতে এগোচ্ছে।

বুর্জোয়া শ্রেণি নিজেই কোনো পথ দেখছে না। যেসব দেশে তারা ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদের তাসে তাদের শেষ সম্বলটুকু বাজি ধরতে বাধ্য হয়েছে, সেখানে তারা এখন চোখ বুজে অর্থনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয়ের দিকে গড়িয়ে নামছে। ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাভোগী দেশগুলোতে; অর্থাৎ, যেখানে জাতীয় সঞ্চয়ের খরচে বুর্জোয়ারা আরও কিছুকাল গণতন্ত্রের বিলাসিতা করতে পারে (যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি), সেখানে পুঁজির সব ঐতিহ্যবাহী দল এমন দিশেহারা অবস্থায় আছে, যা ইচ্ছাশক্তির পক্ষাঘাতের কাছাকাছি।

"নিউ ডিল" তার প্রথম পর্বের ভান করা দৃঢ়তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিশেহারার এক বিশেষ রূপ মাত্র, যা কেবল সেই দেশেই সম্ভব যেখানে বুর্জোয়ারা অপরিমেয় সম্পদ জমাতে পেরেছে। বর্তমান সংকট এখনও তার পূর্ণ গতিপথ শেষ করেনি, কিন্তু এর মধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টের রাজনীতির মতো "নিউ ডিল" এর রাজনীতিও অর্থনৈতিক কানাগলি থেকে বেরোনোর কোনো নতুন পথ খুলে দেয় না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চিত্রও এর চেয়ে ভালো নয়। পুঁজিবাদী ভাঙনের ক্রমবর্ধমান চাপে সাম্রাজ্যবাদী বৈরিতা এমন এক অচলাবস্থায় পৌঁছেছে, যার চূড়ান্ত মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও রক্তাক্ত স্থানীয় গোলযোগগুলো (ইথিওপিয়া, স্পেন, দূরপ্রাচ্য, মধ্য ইউরোপ) অনিবার্যভাবে মিলে গিয়ে বিশ্বজোড়া দাবানলে পরিণত হবে। বুর্জোয়ারা অবশ্যই জানে, নতুন একটি যুদ্ধ তাদের আধিপত্যের জন্য প্রাণঘাতী বিপদ। কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রাক্কালের তুলনায় এই শ্রেণি আজ যুদ্ধ ঠেকাতে অপরিমেয়ভাবে কম সক্ষম।

সমাজতন্ত্রের জন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এখনও "পাকেনি"-এ ধরনের সব কথাবার্তা হয় অজ্ঞতার ফল, নয়তো সচেতন প্রতারণা। মজদুর বিপ্লবের বস্তুগত পূর্বশর্ত কেবল "পেকে" ওঠেনি; তাতে খানিকটা পচনও ধরতে শুরু করেছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া, এবং তাও আসন্ন ঐতিহাসিক পর্বেই, মানবজাতির গোটা সংস্কৃতি বিপর্যয়ের মুখে। এখন পালা মজদুর শ্রেণির, অর্থাৎ প্রধানত তার বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর। মানবজাতির ঐতিহাসিক সংকট শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী নেতৃত্বের সংকটে এসে ঠেকেছে।

মজদুর শ্রেণি ও তার নেতৃত্ব

অর্থনীতি, রাষ্ট্র, বুর্জোয়াদের রাজনীতি ও তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সবকিছুই এক সামাজিক সংকটে পুরোপুরি ক্ষয়গ্রস্ত, যা সমাজের প্রাক্-বিপ্লবী অবস্থার বৈশিষ্ট্য। প্রাক্-বিপ্লবী অবস্থাকে বিপ্লবী অবস্থায় রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হলো মজদুর নেতৃত্বের সুবিধাবাদী চরিত্র: বড় বুর্জোয়াদের সামনে তার পেটি-বুর্জোয়া ভীকৃত্য, এবং বুর্জোয়াদের মৃত্যুযন্ত্রণার মুহূর্তেও তাদের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতক গাঁটছড়া।

সব দেশেই মজদুর শ্রেণি গভীর অস্থিরতায় আলোড়িত। কোটি কোটি মানুষ বারবার বিপ্লবের পথে নামছে। কিন্তু প্রতিবারই তাদের পথ আটকে দিচ্ছে তাদেরই রক্ষণশীল আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র।

১৯৩১ সালের এপ্রিল থেকে স্পেনের মজদুর শ্রেণি ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে সমাজের ভাগ্য পরিচালনার জন্য একের পর এক বীরোচিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তার নিজের দলগুলোই (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, স্টালিনপন্থী, নৈরাজ্যবাদী, পোউম (POUM)-পন্থী), প্রত্যেকে নিজের নিজের ভঙ্গিতে ব্রেকের কাজ করে ফ্রান্সোর বিজয়ের পথ তৈরি করেছে।

ফ্রান্সে "অবস্থান" ধর্মঘটের বিশাল চেউ, বিশেষত ১৯৩৬ সালের জুনে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য মজদুর শ্রেণির সর্বান্তঃকরণ প্রস্তুতি প্রকাশ করে দিয়েছিল। কিন্তু নেতৃস্থানীয় সংগঠনগুলো (সমাজতন্ত্রী, স্টালিনপন্থী, সিন্ডিক্যালিস্ট) পপুলার ফ্রন্টের তকমার আড়ালে বিপ্লবী শ্রোতাকে অন্তত সাময়িকভাবে খালে চুকিয়ে বাঁধ দিয়ে আটকে ফেলতে সক্ষম হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ধর্মঘটের নজিরবিহীন চেউ এবং শিল্পভিত্তিক ইউনিয়নবাদের (সিআইও) বিস্ময়কর দ্রুত বিকাশ, ইতিহাস তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্বের স্তরে নিজেদের উন্নীত করার জন্য মার্কিন শ্রমিকদের সহজাত আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে অকাট্য প্রকাশ। কিন্তু এখানেও নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো (নবগঠিত সিআইও সহ) জনগণের বিপ্লবী চাপকে ঠেকিয়ে রাখতে ও পশু করে দিতে যথাসাধ্য সবকিছু করছে।

কমিন্টার্নের চূড়ান্তভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থার পক্ষে চলে যাওয়া এবং সারা বিশ্বে, বিশেষত স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য "গণতান্ত্রিক" দেশে, তার নির্লজ্জ প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা বিশ্ব মজদুর শ্রেণির জন্য ব্যতিক্রমী বাড়তি সমস্যা

তৈরি করেছে। অক্টোবর বিপ্লবের পতাকা উঁচিয়ে "গণফ্রন্ট" যে আপসের রাজনীতি চর্চা করে, তা শ্রমিক শ্রেণিকে অক্ষমতায় দগ্ধিত করে এবং ফ্যাসিবাদের পথ পরিষ্কার করে দেয়।

একদিকে "গণফ্রন্ট", অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ: মজদুর বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগুলোই সাম্রাজ্যবাদের শেষ রাজনৈতিক সম্বল। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি সম্বলই জোড়াতালি মাত্র। জার্মানিতে স্বস্তিক [Swastika] চিহ্নের নিচে যেমন, ফ্রান্সে ফ্রিজীয় [Phrygian] টুপির চিহ্নের নিচেও তেমনি পুঁজিবাদের পচন চলছে। বুর্জোয়াদের উৎখাত ছাড়া আর কিছুই মুক্তির পথ খুলতে পারে না।

জনগণের দিশা নির্ধারিত হয় প্রথমত পচনশীল পুঁজিবাদের বস্তুগত পরিস্থিতি দিয়ে, এবং দ্বিতীয়ত পুরোনো শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিশ্বাসঘাতক রাজনীতি দিয়ে। এর মধ্যে প্রথমটিই অবশ্যই নির্ধারক: ইতিহাসের নিয়ম আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সমাজতন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকদের পদ্ধতি যত ভিন্নই হোক, ক্লমের "সামাজিক" আইন থেকে স্তালিনের সাজানো বিচার পর্যন্ত, তারা কখনোই মজদুর শ্রেণির বিপ্লবী ইচ্ছাকে ভাঙতে পারবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের চাকা আটকে রাখার জন্য তাদের মরিয়া চেষ্টাই জনগণের কাছে আরও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবে যে মজদুর নেতৃত্বের সংকট, যা এখন মানবসংস্কৃতির সংকটে পরিণত হয়েছে, তার সমাধান কেবল চতুর্থ আন্তর্জাতিকই করতে পারে।

ন্যূনতম কর্মসূচি ও অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচি

আসন্ন পর্বের (প্রচার, আন্দোলন ও সংগঠনের প্রাক্-বিপ্লবী পর্বের) রণনৈতিক কর্তব্য হলো বস্তুগত বিপ্লবী পরিস্থিতির পরিপক্বতা এবং মজদুর শ্রেণি ও তার অগ্রবাহিনীর অপরিপক্বতার (পুরোনো প্রজন্মের বিভ্রান্তি ও হতাশা, তরুণ প্রজন্মের অনভিজ্ঞতা) মধ্যকার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠা। দৈনন্দিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণকে সাহায্য করতে হবে বর্তমান দাবি আর বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচির মধ্যে সেতুবন্ধ খুঁজে পেতে। এই সেতুতে থাকতে হবে অন্তর্বর্তীমূলক দাবির এক ব্যবস্থা, যা আজকের পরিস্থিতি এবং শ্রমিক শ্রেণির ব্যাপক অংশের আজকের চেতনা থেকে উৎসারিত, এবং যা অনিবার্যভাবে একটিমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়: মজদুর শ্রেণির ক্ষমতা দখল।

ক্ষুধা সোশ্যাল ডেমোক্রেসি, যা প্রগতিশীল পুঁজিবাদের যুগে কাজ করত, তার কর্মসূচিকে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই ভাগে ভাগ করেছিল: ন্যূনতম কর্মসূচি, যা বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর ভেতরে সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল; আর সর্বোচ্চ কর্মসূচি, যা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পুঁজিবাদের জায়গায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিত। ন্যূনতম আর সর্বোচ্চ কর্মসূচির মাঝে কোনো সেতু ছিল না। আর সত্যিই, সোশ্যাল ডেমোক্রেসির এমন সেতুর কোনো প্রয়োজনও নেই, কারণ "সমাজতন্ত্র" শব্দটি তাদের কাছে কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতার জন্য। কমিউটার্ণ পচনশীল পুঁজিবাদের যুগে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির পথ অনুসরণ করতে নেমেছে, এমন এক যুগে, যখন সাধারণভাবে নিয়মিত সামাজিক সংস্কার বা জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর কোনো আলোচনাই চলে না; যখন মজদুর শ্রেণির প্রতিটি গুরুতর দাবি, এমনকি পেটি-বুর্জোয়াদের প্রতিটি গুরুতর দাবিও, অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী সম্পত্তি-সম্পর্ক ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের রণনৈতিক কর্তব্য পুঁজিবাদের সংস্কার নয়, তার উৎখাত। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো বুর্জোয়াদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে মজদুর শ্রেণির ক্ষমতা দখল। কিন্তু রণকৌশলের সব প্রশ্নে, এমনকি ছোট ও আংশিক প্রশ্নেও, সবচেয়ে সুচিন্তিত মনোযোগ ছাড়া এই রণনৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন করা অকল্পনীয়। মজদুর শ্রেণির সব অংশ, সব স্তর, সব পেশা ও গোষ্ঠীকে বিপ্লবী আন্দোলনে টেনে আনতে হবে। বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য এই নয় যে এটি বিপ্লবী পার্টিকে দৈনন্দিন কাজ থেকে মুক্তি দেয়; বরং এই যে, এটি সেই কাজকে বিপ্লবের প্রকৃত কর্তব্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে চালানোর সুযোগ দেয়।

পুরোনো "নূনতম" দাবিগুলো যতটুকু পর্যন্ত তাদের প্রাণশক্তির অন্তত কিছুটা ধরে রেখেছে, ততটুকু পর্যন্ত চতুর্থ আন্তর্জাতিক সেই কর্মসূচিকে বাতিল করে না। অক্লান্তভাবে সে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সামাজিক অর্জনগুলো রক্ষা করে। কিন্তু এই দৈনন্দিন কাজ সে চালায় সঠিক, বাস্তব, অর্থাৎ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর মধ্যে। জনগণের পুরোনো, আংশিক, "নূনতম" দাবিগুলো যতই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক ও অবমাননাকর প্রবণতার সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় (আর তা ঘটে প্রতি পদে), ততই চতুর্থ আন্তর্জাতিক অন্তর্বর্তীমূলক দাবির এক ব্যবস্থা সামনে আনে, যার সারকথা হলো: এই দাবিগুলো ক্রমেই আরও খোলাখুলি ও দৃঢ়ভাবে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার একেবারে ভিত্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। পুরোনো "নূনতম কর্মসূচি"-র জায়গা নেয় অন্তর্বর্তীমূলক কর্মসূচি, যার কর্তব্য হলো মজদুর বিপ্লবের জন্য জনগণকে পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত ও সচল করা।

মজুরির চলমান মাপকাঠি ও কর্মঘণ্টার চলমান মাপকাঠি

ভেঙে পড়তে থাকা পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে জনগণ নিপীড়িতের দীনহীন জীবনই যাপন করে চলেছে, আর আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তাদের মাথার ওপর ঝুলছে নিঃস্বতার গহ্বরে ছিটকে পড়ার বিপদ। মুখের গ্রাস বাড়তে বা উন্নত করতে না পারলেও, অন্তত যতটুকু আছে সেটুকু তাদের রক্ষা করতেই হবে। জাতীয়, স্থানীয় বা ট্রেড ইউনিয়নগত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে বারবার যেসব আলাদা আলাদা, আংশিক দাবি ওঠে, সেগুলোর তালিকা এখানে দেওয়ার প্রয়োজনও নেই, সুযোগও নেই। কিন্তু দুটি মৌলিক অর্থনৈতিক ব্যাধি, বেকারত্ব ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, যাদের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অযৌক্তিকতার সারকথা ধরা পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন সাধারণীকৃত স্লোগান ও সংগ্রামের পদ্ধতি।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে আপসহীন যুদ্ধ ঘোষণা করছে যার লক্ষ্য, অনেকাংশে তাদের দালাল সংস্কারবাদীদের রাজনীতির মতোই, সমরবাদ, সংকট, মুদ্রাব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এবং পুঁজিবাদের মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে জন্ম নেওয়া সব অভিশাপের পুরো বোঝা মেহনতি মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া। চতুর্থ আন্তর্জাতিক সবার জন্য কাজ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার দাবি জানায়।

মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মুদ্রার স্থিতিশীলকরণ কোনোটিই মজদুর শ্রেণির স্লোগান হতে পারে না, কারণ এ দুটো একই লাঠির দুই প্রান্ত মাত্র। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা দাম, যা যুদ্ধের নিকটবর্তীতার সাথে লাগামছাড়া হয়ে উঠবে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় কেবল মজুরির চলমান মাপকাঠির [sliding scale] স্লোগান নিয়ে। এর অর্থ হলো, যৌথ চুক্তিগুলোতে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে ভোগ্যপণ্যের দাম যতটা বাড়বে, মজুরিও ততটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে।

নিজের বিলুপ্তির হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে মজদুর শ্রেণি এটা মেনে নিতে পারে না যে শ্রমিকদের এক ক্রমবর্ধমান অংশ স্থায়ী বেকার নিঃস্বে পরিণত হবে, ধসে পড়া এক সমাজের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচবে। শোষণের ওপর দাঁড়ানো সমাজে শ্রমিকের হাতে যে একটিমাত্র গুরুতর অধিকার অবশিষ্ট আছে, তা হলো কাজের অধিকার। অথচ আজ প্রতি পদে সেই অধিকারও তার কাছ থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। "কাঠামোগত" ও "বাজারচক্রজনিত", উভয় ধরনের বেকারত্বের বিরুদ্ধে গণপূর্ত কাজের স্লোগানের পাশাপাশি কর্মঘণ্টার চলমান মাপকাঠির স্লোগান তোলার সময় এসে গেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণসংগঠনকে, পারস্পরিক দায়বদ্ধতার সংহতিতে, কর্মরত শ্রমিক আর

বেকারদের একসূত্রে বাঁধতে হবে। এর ভিত্তিতে হাতে থাকা সমস্ত কাজ বিদ্যমান সব শ্রমিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে, আর সেই ভাগ অনুযায়ীই ঠিক হবে কর্মসপ্তাহ কতটা দীর্ঘ হবে। প্রত্যেক শ্রমিকের গড় মজুরি পুরোনো কর্মসপ্তাহে যা ছিল, তা-ই থাকবে। কঠোরভাবে নিশ্চিত একটি ন্যূনতম সীমা বজায় রেখে মজুরি দামের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে। বর্তমান বিপর্যয়কর সময়ের জন্য এ ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা অসম্ভব।

সম্পত্তির মালিকেরা আর তাদের উকিলেরা প্রমাণ করতে নামবে যে এসব দাবি "বাস্তবায়নযোগ্য নয়"। ছোট, বিশেষত সর্বস্বান্ত পুঁজিপতিরা এর সঙ্গে তাদের হিসাবের খাতা দেখাবে। শ্রমিকেরা এমন সিদ্ধান্ত আর এমন দোহাই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে। প্রশ্নটা পরস্পরবিরোধী বৈষয়িক স্বার্থের কোনো "স্বাভাবিক" সংঘাতের নয়। প্রশ্নটা হলো মজদুর শ্রেণিকে অবক্ষয়, মনোবল-ভাঙন ও সর্বনাশ থেকে রক্ষা করার। প্রশ্নটা একমাত্র সৃজনশীল ও প্রগতিশীল শ্রেণির জীবন-মরণের, আর সেই সূত্রে মানবজাতির ভবিষ্যতের। পুঁজিবাদ যদি তার নিজেরই সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে অনিবার্যভাবে উঠে আসা দাবিগুলো মেটাতে অক্ষম হয়, তবে তার ধ্বংস হোক! "বাস্তবায়নযোগ্যতা" বা "অবাস্তবায়নযোগ্যতা" এ ক্ষেত্রে তা শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্ন, যার মীমাংসা হতে পারে কেবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই, তার তাৎক্ষণিক বাস্তব সাফল্য যা-ই হোক না কেন, শ্রমিকেরা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবে পুঁজিবাদী দাসত্বের অবসান ঘটানো কতটা জরুরি।

অন্তর্বর্তীকালীন যুগে ট্রেড ইউনিয়ন

আংশিক ও অন্তর্বর্তীমূলক দাবির সংগ্রামে শ্রমিকদের আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন গণসংগঠনের, প্রধানত ট্রেড ইউনিয়নের। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রবল বিকাশই সেইসব অতিবাহিত মতাবলম্বীর উপদেশের সবচেয়ে ভালো খণ্ডন, যারা শিথিলে আসছে যে ট্রেড ইউনিয়নের "প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে"।

বলশেভিক-লেনিনবাদী সব ধরনের সংগ্রামের সম্মুখসারির পরিখায় দাঁড়ান, এমনকি যখন সেই সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণির নিতান্ত সামান্য বৈষয়িক স্বার্থ বা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নেও সীমিত থাকে। গণ-ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং তাদের সংগ্রামী মনোবল বাড়াতে তিনি সেগুলোতে সক্রিয় অংশ নেন। ইউনিয়নগুলোকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অধীন করার এবং মজদুর শ্রেণিকে "বাধ্যতামূলক সালিশি" আর অন্য সব ধরনের পুলিশি অভিভাবকত্বে, শুধু ফ্যাসিবাদী নয়, "গণতান্ত্রিক" অভিভাবকত্বেও, বেঁধে ফেলার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি আপসহীন লড়াই চালান। ট্রেড ইউনিয়নের ভেতরে এমন কাজের ভিত্তিতেই কেবল সংস্কারবাদীদের, স্থালিনপন্থী আমলাতন্ত্রের সংস্কারবাদীদেরও, বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম সম্ভব। পার্টির দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে ছোট ছোট "বিপ্লবী" ইউনিয়ন গড়ে তোলা বা চিকিয়ে রাখার সংকীর্ণতাবাদী প্রচেষ্টার প্রকৃত অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব অর্জনের সংগ্রাম পরিত্যাগ করা। এই দৃঢ় নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন: গণ-ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আত্মসমর্পণবাদী ধাঁচের স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্নতা, যা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর, চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সদস্যদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

একই সঙ্গে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেটিশিজমকে, যা ট্রেড ইউনিয়নবাদী ও সিন্ডিক্যালিস্ট উভয়েরই সমান বৈশিষ্ট্য, দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করে।

- ট্রেড ইউনিয়ন কোনো পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী কর্মসূচি দেয় না, এবং তাদের কর্তব্য, গঠন ও সদস্য সংগ্রহের ধরনের কারণে দিতে পারেও না; ফলে তারা পার্টির বিকল্প হতে পারে না। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখা হিসেবে জাতীয় বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলাই অন্তর্বর্তীকালীন যুগের কেন্দ্রীয় কর্তব্য।
- ট্রেড ইউনিয়ন, এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালীগুলোও, শ্রমিক শ্রেণির ২০ থেকে ২৫ শতাংশের বেশি অংশকে ধারণ করে না, আর তা-ও প্রধানত বেশি দক্ষ ও বেশি বেতনের স্তরগুলোকে। শ্রমিক শ্রেণির অধিকতর

নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংগ্রামে টানা পড়ে কেবল মাঝে মাঝে, শ্রমিক আন্দোলনের ব্যতিক্রমী জোয়ারের সময়ে। এমন মুহূর্তে পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সংগঠন গড়ে তোলা জরুরি, যা গোটা সংগ্রামী জনতাকে ধারণ করবে: ধর্মঘট কমিটি, কারখানা কমিটি, এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত।

- মজদুর শ্রেণির ওপরের স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আপসের প্রবল প্রবণতা গড়ে উঠেছে। অতীতের সমস্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, স্পেনের অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট ইউনিয়নগুলোর টাটকা অভিজ্ঞতাসহ, তার সাক্ষী। তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলো গণআন্দোলনের প্রভু হয়ে উঠতে চায়, যাতে তাকে নির্বিঘ্ন করে ফেলা যায়। নিছক সাদামাটা ধর্মঘটের পর্যায়েই এটা ঘটছে, বিশেষত বুর্জোয়া সম্পত্তির নীতিকে নাড়িয়ে দেওয়া ব্যাপক অবস্থান ধর্মঘটের ক্ষেত্রে। যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময়, যখন বুর্জোয়া শ্রেণি ব্যতিক্রমী সংকটে ডুবে যায়, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সাধারণত বুর্জোয়া মন্ত্রী বনে যান।

অতএব চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে কেবল ট্রেড ইউনিয়নের শীর্ষ নেতৃত্বকে নবায়ন করতেই নয়, সংকটময় মুহূর্তে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে গতবঁধা কর্মকর্তা আর ক্যারিয়ারবাদীদের জায়গায় নতুন সংগ্রামী নেতাদের সামনে এনে, সাথে যেখানে যেখানে সম্ভব, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের কর্তব্যের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলে এমন স্বাধীন সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তুলতেও; আর প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়নের রক্ষণশীল যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কচ্ছেদের সামনেও পিছপা না হতে। সংকীর্ণতাবাদী কল্লকাহিনি লালনের জন্য গণসংগঠনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেওয়া যদি অপরাধ হয়, তবে বিপ্লবী গণআন্দোলনকে খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা ছদ্মবেশী রক্ষণশীল ("প্রগতিশীল") আমলাতান্ত্রিক চক্রের নিয়ন্ত্রণে নিষ্ক্রিয়ভাবে ছেড়ে দেওয়াও কম অপরাধ নয়। ট্রেড ইউনিয়ন নিজেই লক্ষ্য নয়; মজদুর বিপ্লবের পথে সেগুলো উপায় মাত্র।

কারখানা কমিটি

অন্তর্বর্তীকালীন যুগে শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র নিয়মবদ্ধ ও সুসম নয়, বরং উত্তেজিত ও বিস্ফোরক। স্লোগান এবং সাংগঠনিক রূপ, দুটোকেই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির অধীন হতে হবে। গতবাঁধা পথে পরিস্থিতি সামলানোর প্রবণতাকে মহামারীর মতো ভয় করে, নেতৃত্বকে জনগণের উদ্যোগে সংবেদনশীলভাবে সাড়া দিতে হবে।

অবস্থান ধর্মঘট, এই ধরনের উদ্যোগের সর্বশেষ প্রকাশ, "স্বাভাবিক" পুঁজিবাদী রীতিনীতির সীমা ছাড়িয়ে যায়। ধর্মঘটীদের দাবি যা-ই হোক, কারখানার সাময়িক দখল পুঁজিবাদী সম্পত্তি নামের দেবমূর্তির ওপর আঘাত হানে। প্রতিটি অবস্থান ধর্মঘট হাতে-কলমে এই প্রশ্ন তোলে: কারখানার মালিক কে? পুঁজিপতি, না শ্রমিকেরা?

অবস্থান ধর্মঘট যদি এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে তোলে, কারখানা কমিটি তাকে দেয় সংগঠিত রূপ। কারখানার সব কর্মীর ভোটে নির্বাচিত কারখানা কমিটি সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের ইচ্ছার বিপরীতে এক পাল্টা ভার তৈরি করে।

ফোর্ডের মতো তথাকথিত "অর্থনৈতিক রাজতন্ত্রী" ধাঁচের মালিকদের "ভালো", "গণতান্ত্রিক" শোষকদের থেকে আলাদা করে সংস্কারবাদীরা যে সমালোচনা করে, তার বিপরীতে আমরা তুলে ধরি কারখানা কমিটির স্লোগান, প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় ধরনের শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্র হিসেবে।

ট্রেড ইউনিয়নের আমলারা সাধারণ নিয়মেই কারখানা কমিটি গঠনের বিরোধিতা করবে, ঠিক যেমন জনগণকে সংগঠিত ও সচল করার পথে প্রতিটি সাহসী পদক্ষেপের বিরোধিতা তারা করে।

তবে আন্দোলনের পরিসর যত বিস্তৃত হবে, এই প্রতিরোধ ভাঙা তত সহজ হবে। যেখানে "শান্তিপূর্ণ" সময়েই ক্লোজড শপ [কেবল ইউনিয়ন সদস্যদের নিয়োগের ব্যবস্থা] চালু হয়ে গেছে, সেখানে কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নের প্রচলিত সংস্কার সঙ্গে মিলে যাবে, কিন্তু তার লোকবল নবায়ন করবে এবং তার কাজের পরিধি বাড়াবে। তবে কমিটির প্রধান তাৎপর্য হলো, শ্রমিক শ্রেণির সেইসব স্তরের জন্য এটি সংগ্রামী সদর দপ্তর হয়ে ওঠে, যাদের ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত কাজে নামাতে অক্ষম। আর ঠিক এই অধিকতর নিপীড়িত স্তরগুলো থেকেই উঠে আসবে বিপ্লবের সবচেয়ে আত্মত্যাগী বাহিনীগুলো।

কমিটি আবির্ভূত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই কারখানায় কার্যত দ্বৈত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সারবস্তুতেই এটি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার প্রতিরূপ, কারণ এর ভেতরে পাশাপাশি রয়েছে দুটি অমীমাংসেয় শাসনব্যবস্থা: পুঁজিবাদী

ও মজদুর। কারখানা কমিটির মৌলিক তাৎপর্য ঠিক এখানেই যে, এরা দরজা খুলে দেয়, সরাসরি বিপ্লবী পর্বের না হলেও, বুর্জোয়া ও মজদুর শাসনব্যবস্থার মাঝখানের এক প্রাক্-বিপ্লবী পর্বের। কারখানা কমিটির ধারণা প্রচার করা যে অকালপঙ্ক বা কৃত্রিম নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়া অবস্থান ধর্মঘটের ডেউ। অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের নতুন ডেউ অনিবার্য। অপ্রস্তুত অবস্থায় যাতে ধরা পড়তে না হয়, সে জন্য কারখানা কমিটির পক্ষে সময় থাকতে প্রচারাভিযান শুরু করা জরুরি।

"ব্যবসায়িক গোপনীয়তা" ও শিল্পে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ

প্রতিযোগিতা ও অবাদ বাণিজ্যের ওপর দাঁড়ানো উদারনৈতিক পুঁজিবাদ পুরোপুরি অতীতে মিলিয়ে গেছে। তার উত্তরসূরি একচেটিয়া পুঁজিবাদ বাজারের নৈরাজ্য কমায় তো না-ই, উল্টো তাকে দেয় এক বিশেষ রকমের খঁচুনিময়[convulsive] চরিত্র। অর্থনীতিকে "নিয়ন্ত্রণ" করা, শিল্পের ওপর রাষ্ট্রের "পরিচালনা" বসানো এবং "পরিকল্পনা"-র প্রয়োজনীয়তা আজ স্বীকার করে, অন্তত মুখে, ফ্যাসিবাদী থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পর্যন্ত প্রায় সব প্রচলিত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ধারা। ফ্যাসিবাদীদের কাছে এটা মূলত সামরিক উদ্দেশ্যে জনগণকে "পরিকল্পিতভাবে" লুণ্ঠন করার প্রশ্ন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা আমলাতান্ত্রিক "পরিকল্পনা"-র চামচ দিয়ে নৈরাজ্যের সমুদ্র সঁচে ফেলার আয়োজন করছে। প্রকৌশলী আর অধ্যাপকেরা "টেকনোক্রেসি" নিয়ে প্রবন্ধ লিখছেন। "বিধিনিয়ম আরোপ" এর ভীকু পরীক্ষানিরীক্ষায় গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বৃহৎ পুঁজির অপরাজেয় অন্তর্ঘাতের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা খায়।

শোষক আর গণতান্ত্রিক "নিয়ন্ত্রকদের" মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, "সংস্কারক" মহাশয়েরা ট্রাস্টগুলোর চৌকাঠে, তাদের ব্যবসায়িক "গোপনীয়তা"-র সামনে এসে ধর্মভীকু আতঙ্কে থমকে দাঁড়ান। এখানে রাজত্ব করে ব্যবসায় "হস্তক্ষেপ না করার" নীতি। একক পুঁজিপতি আর সমাজের মধ্যে যে হিসাব চলে, তা পুঁজিপতির গোপন ব্যাপারই থেকে যায়: সমাজের তাতে মাথা গলানোর কিছু নেই। ব্যবসায়িক "গোপনীয়তা"-র নীতির পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়, তা বাহ্যত উদারনৈতিক পুঁজিবাদের যুগের মতোই: অবাদ "প্রতিযোগিতা"। বাস্তবে ট্রাস্টগুলো একে অপরের কাছে কিছুই গোপন রাখে না। বর্তমান যুগের ব্যবসায়িক গোপনীয়তা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে একচেটিয়া পুঁজির এক নিরন্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। "অর্থনৈতিক রাজতন্ত্রীদের" স্বৈরাচার খর্ব করার প্রকল্পগুলো ততদিন করুণ প্রহসনই থেকে যাবে, যতদিন সামাজিক উৎপাদন-উপায়ের ব্যক্তিমালিকেরা উৎপাদক ও ভোক্তাদের চোখের আড়ালে শোষণ, লুণ্ঠন আর প্রতারণার কারসাজি লুকিয়ে রাখতে পারবে। "ব্যবসায়িক গোপনীয়তা"-র বিলোপই শিল্পের ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

কারখানার, ট্রাস্টের, গোটা শিল্পশাখার, সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির "গোপন কথা" জানার অধিকার পুঁজিপতিদের চেয়ে শ্রমিকদের কোনো অংশে কম নয়। সর্বাগ্রে ব্যাংক, ভারী শিল্প ও কেন্দ্রীভূত পরিবহনব্যবস্থাকে আতশকাচের নিচে রাখতে হবে।

শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের আশু কর্তব্য হবে: একক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সমাজের দেনা-পাওনার হিসাব খোলসা করা; জাতীয় আয়ের কতটা প্রকৃতপক্ষে একক পুঁজিপতিরা এবং সামগ্রিকভাবে শোষকেরা আত্মসাৎ করে, তা নির্ধারণ করা; ব্যাংক ও ট্রাস্টগুলোর পর্দার আড়ালের লেনদেন আর জালিয়াতি ফাঁস করা; এবং সবশেষে, সমাজের সব সদস্যের সামনে মানবশ্রমের সেই বিবেকহীন অপচয় উন্মোচন করা, যা পুঁজিবাদী নৈরাজ্য আর মুনাফার নগ্ন অব্বেষণের ফল।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কোনো পদাধিকারীই এই কাজ করার অবস্থানে নেই, তাকে যত বড় কর্তৃত্বই দেওয়া হোক না কেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী ক্লিম নিজ নিজ দেশের "৬০ পরিবার" বা "২০০ পরিবার"-এর চক্রান্তের সামনে কতটা অসহায়, গোটা দুনিয়া তা দেখেছে। শোষকদের প্রতিরোধ ভাঙতে প্রয়োজন মজদুর শ্রেণির গণচাপ। কেবল কারখানা কমিটিই উৎপাদনের ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে- জনগণের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিত বিশেষজ্ঞদের, অর্থাৎ হিসাবরক্ষক, পরিসংখ্যানবিদ, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী প্রমুখকে ডেকে এনে, তবে পরামর্শক হিসেবে, "টেকনোক্রেট" হিসেবে নয়।

ব্যাপক ও সাহসী গণপূর্ত কর্মসূচি সংগঠনের আহ্বান ছাড়া বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু গণপূর্ত কাজ সমাজের জন্য, তেমনি বেকারদের নিজেদের জন্যও, ধারাবাহিক ও প্রগতিশীল তাৎপর্য পেতে পারে কেবল তখনই, যখন তা বেশ কয়েক বছর জুড়ে প্রণীত একটি সাধারণ পরিকল্পনার অংশ হয়। এই পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে শ্রমিকেরা দাবি তুলবে, সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবার কাজ চালু করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের জায়গা নেবে সরাসরি শ্রমিক পরিচালনা।

এমনকি সবচেয়ে প্রাথমিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নও- শোষিতের দৃষ্টিকোণ থেকে, শোষকের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়- শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অসম্ভব, অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকাশ্য ও গোপন সব কলকন্ডার ভেতরে শ্রমিকদের চোখ না পোঁছালে অসম্ভব। একক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী কমিটিগুলোকে সম্মেলনে মিলিত হয়ে ট্রাস্ট, গোটা শিল্পশাখা, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতীয় শিল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি নির্বাচন করতে হবে। এভাবে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে পরিকল্পিত অর্থনীতির এক পাঠশালা। নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মজদুর শ্রেণি জাতীয়কৃত শিল্প সরাসরি পরিচালনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে, যখন সেই ক্ষণ আসবে তার অপেক্ষায়।

সেইসব পুঁজিপতি, প্রধানত নিম্ন ও মধ্য স্তরের, যারা কখনো কখনো নিজে থেকেই শ্রমিকদের সামনে তাদের খাতাপত্র খুলে দিতে চায়- সাধারণত মজুরি কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখানোর জন্য- তাদের শ্রমিকেরা জবাব দেয়: একক দেউলিয়া বা আধা-দেউলিয়াদের হিসাবনিকাশে তাদের আগ্রহ নেই, তাদের আগ্রহ সমস্ত শোষকের সামগ্রিক হিসাবের খাতায়। শ্রমিকেরা নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে একক পুঁজিপতিদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, চায়ও না, সেই পুঁজিপতিরা নিজেরাই তো তাদের নিজেদের ব্যবস্থার শিকার। কর্তব্য হলো উৎপাদন ও বণ্টনের গোটা ব্যবস্থাকে আরও মর্যাদাপূর্ণ ও কার্যকর ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা। ব্যবসায়িক গোপনীয়তার বিলোপ যদি শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যিক শর্ত হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ হলো অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পরিচালনার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

পুঁজিপতিদের পৃথক গোষ্ঠীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ

সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক উৎখাত এবং তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্যের অবসান, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন পর্বে কোনো অবস্থাতেই আমাদের এই দাবি তোলা থেকে বিরত রাখবে না যে, পরিস্থিতি যখন তা দাবি করে, জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য কয়েকটি মূল শিল্পশাখার, কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণির সবচেয়ে পরজীবী গোষ্ঠীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক।

এভাবেই, যুক্তরাষ্ট্রের "৬০ পরিবার" বা ফ্রান্সের "২০০ পরিবার" এর একনায়কত্ব নিয়ে গণতন্ত্রী মহাশয়দের করুণ বিলাপের জবাবে আমরা তুলে ধরি সেই ৬০ বা ২০০ সামন্তসুলভ পুঁজিপতি প্রভুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবি।

ঠিক একইভাবে আমরা দাবি করি, যুদ্ধশিল্প, রেলপথ, কাঁচামালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস ইত্যাদির ওপর একচেটিয়া অধিকার ভোগকারী কর্পোরেশনগুলোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

এই দাবিগুলোর সঙ্গে "জাতীয়করণ" এর বিভ্রান্ত সংস্কারবাদী স্লোগানের পার্থক্য এখানে: (১) আমরা ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করি; (২) আমরা জনগণকে গণফ্রন্টের সেইসব গলাবাজ নেতা সম্পর্কে সতর্ক করি, যারা মুখে জাতীয়করণের বুলি আওড়ালেও বাস্তবে পুঁজিরই দালাল থেকে যায়; (৩) আমরা জনগণকে আহ্বান জানাই কেবল নিজেদের বিপ্লবী শক্তির ওপর ভরসা করতে; (৪) আমরা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের প্রশ্নকে শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতা দখলের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করি।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের স্লোগানকে কেবল আমাদের প্রচারে তার সর্বাঙ্গীণ রূপে নয়, দৈনন্দিন আন্দোলনেও আংশিক রূপে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আসে এই বাস্তবতা থেকে যে, বিভিন্ন শিল্পশাখা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, সমাজজীবনে ভিন্ন ভিন্ন স্থান দখল করে আছে এবং শ্রেণিসংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় পার হচ্ছে। কেবল মজদুর শ্রেণির এক সাধারণ বিপ্লবী জোয়ারই বুর্জোয়াদের সম্পত্তির সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্তকরণকে দিনের কর্মসূচিতে তুলে আনতে পারে। অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্তব্য হলো এই সমস্যার সমাধানের জন্য মজদুর শ্রেণিকে প্রস্তুত করা।

বেসরকারি ব্যাংকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও ঋণব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ

সাম্রাজ্যবাদ মানে লগ্নিপুঁজির [Finance capital] আধিপত্য। ট্রাস্ট ও সিন্ডিকেটের পাশাপাশি, এবং প্রায়ই তাদের ছাপিয়ে উঠে, ব্যাংকগুলো অর্থনীতির ওপর প্রকৃত কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে। নিজেদের কাঠামোয় ব্যাংকগুলো ঘনীভূত রূপে আধুনিক পুঁজির গোটা কাঠামোকেই প্রকাশ করে: তারা একচেটিয়ার প্রবণতার সঙ্গে নৈরাজ্যের প্রবণতাকে মেলায়। তারা সংগঠিত করে প্রযুক্তির বিস্ময়, দৈত্যাকার প্রতিষ্ঠান, পরাক্রমশালী ট্রাস্ট; আবার তাহাই সংগঠিত করে চড়া দাম, সংকট আর বেকারত্ব। একচেটিয়া স্বৈরতন্ত্র ও পুঁজিবাদী নৈরাজ্য-ধ্বংসের কাজে যারা একে অপরের পরিপূরক-তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটিও গুরুতর পদক্ষেপ নেওয়া অসম্ভব, যদি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক আসনগুলো লুটেরা পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে রাখা হয়। গোটা জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এক যুক্তিসংগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ ও ঋণের একীভূত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সব ব্যাংককে একটি একক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মিলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কেবল বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং গোটা ঋণব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করাই রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৃত, অর্থাৎ বস্তুগত সম্পদ জোগাবে, নিছক কাগজে ও আমলাতান্ত্রিক সম্পদ নয়।

ব্যাংকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের অর্থ কোনো অবস্থাতেই ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত বাজেয়াপ্ত করা নয়। উল্টো, একক রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ক্ষুদ্র আমানতকারীদের জন্য বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল শর্ত তৈরি করতে পারবে। একইভাবে কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকই কৃষক, কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য অনুকূল, অর্থাৎ সম্ভা ঋণের শর্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে, একটি একক আর্থিক পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশনায় গোটা অর্থনীতি, সর্বাত্মক বৃহৎ শিল্প ও পরিবহন, শ্রমিক ও অন্য সব মেহনতি মানুষের প্রাণের স্বার্থে কাজ করবে।

তবে ব্যাংকের রাষ্ট্রীয়করণ এই অনুকূল ফল তখনই দেবে, যখন রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেই শোষকদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মেহনতি মানুষের হাতে চলে আসবে।

পিকেট লাইন, শ্রমিক মিলিশিয়া ও মজদুর শ্রেণির সশস্ত্রীকরণ

অবস্থান ধর্মঘট জনগণের কাছ থেকে আসা এক গুরুতর সতর্কবার্তা যা শুধু বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যে নয়, চতুর্থ আন্তর্জাতিকসহ শ্রমিকদের সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্যেও। ১৯১৯-২০ সালে ইতালির শ্রমিকেরা নিজেদের উদ্যোগে কারখানা দখল করেছিল, আর এভাবেই তারা তাদের "নেতাদের" কাছে সামাজিক বিপ্লব আসন্ন হওয়ার খবর পৌঁছে দিয়েছিল। "নেতারা" সেই সংকেতে কান দেননি। ফলাফল: ফ্যাসিবাদের বিজয়।

অবস্থান ধর্মঘট এখনো ইতালীয় কায়দায় কারখানা দখল নয়, কিন্তু এমন দখলের দিকে এক নির্ধারক পদক্ষেপ। বর্তমান সংকট শ্রেণিসংগ্রামকে চরম বিন্দুতে তীক্ষ্ণ করে তুলতে পারে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মুহূর্তকে কাছে টেনে আনতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে বিপ্লবী পরিস্থিতি এক ধাক্কায় এসে হাজির হয়। আসলে তার আগমনের সংকেত দেয় একের পর এক খিঁচুনি। অবস্থান ধর্মঘটের চেউ তারই একটি। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোর কাজ হলো মজদুর অগ্রবাহিনীকে আমাদের যুগের সাধারণ চরিত্র ও গতি বুঝতে সাহায্য করা, এবং ক্রমেই আরও দৃঢ় ও সংগ্রামী সাংগঠনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সময়মতো জনগণের সংগ্রামকে ফলপ্রসূ করে তোলা।

মজদুর শ্রেণির সংগ্রাম তীব্র হওয়ার অর্থ পুঁজির পাল্টা আক্রমণের পদ্ধতিও তীব্র হওয়া। অবস্থান ধর্মঘটের নতুন চেউ বুর্জোয়াদের দিক থেকে দৃঢ় পাল্টা ব্যবস্থা ডেকে আনতে পারে, এবং নিঃসন্দেহে ডেকে আনবে। বড় বড় ট্রাস্টের গোপন সদর দপ্তরগুলোতে প্রস্তুতির কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। সর্বনাশ হবে বিপ্লবী সংগঠনগুলোর, সর্বনাশ হবে মজদুর শ্রেণির, যদি আবারও তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ে।

বুর্জোয়ারা কোথাও সরকারি পুলিশ আর সেনাবাহিনী নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রে, এমনকি "শান্তিপূর্ণ" সময়েও, বুর্জোয়ারা কারখানাগুলোতে ধর্মঘটভাঙাদের সামরিক ধাঁচের ব্যাটালিয়ন আর ব্যক্তিগতভাবে সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী পুষে রাখে। এর সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে আমেরিকান নাৎসিদের নানা দল। বিপদের প্রথম আভাসেই ফরাসি বুর্জোয়ারা আধা-আইনি ও বেআইনি ফ্যাসিবাদী বাহিনী মাঠে নামিয়েছে, এমনকি সেনাবাহিনীর ভেতরে থাকা বাহিনীও। ইংরেজ শ্রমিকদের চাপ আবার একটু বাড়তেই ফ্যাসিবাদী দলগুলো দ্বিগুণ, তিনগুণ, দশগুণ বেড়ে যায়। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অভিযানে নামার জন্য। বুর্জোয়ারা একেবারে নির্ভুলভাবে জানে যে বর্তমান যুগে শ্রেণিসংগ্রাম অপ্রতিরোধ্যভাবে গৃহযুদ্ধে রূপ নেওয়ার দিকে ঝুঁকছে। ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন ও অন্যান্য

দেশের দৃষ্টান্ত মজদুর শ্রেণির পদস্থ নেতাদের চেয়ে পুঁজির রাঘববোয়াল আর পদলেহীদের অনেক বেশি শিথিয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের রাজনীতিকেরা এবং ট্রেড ইউনিয়নের আমলারা বুর্জোয়াদের ব্যক্তিগত বাহিনীর দিকে সচেতনভাবে চোখ বুজে থাকে; নইলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের জোট তারা চব্বিশ ঘণ্টাও টিকিয়ে রাখতে পারত না। সংস্কারবাদীরা পরিকল্পিতভাবে শ্রমিকদের মনে এই ধারণা গোঁথে দেয় যে বুর্জোয়ারা যখন আপাদমস্তক সশস্ত্র আর শ্রমিকেরা নিরস্ত্র, তখনই গণতন্ত্রের পবিত্রতা সবচেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত থাকে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কর্তব্য হলো এমন দাসসুলভ নীতির চিরতরে অবসান ঘটানো। পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা- সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, স্টালিনপন্থী ও নৈরাজ্যবাদীসহ- ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম নিয়ে যত জোরে চেষ্টা করে যায়, বাস্তবে ফ্যাসিবাদের কাছে ততটাই কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পণ করে। কেবল সশস্ত্র শ্রমিক বাহিনী, যারা নিজেদের পেছনে কোটি কোটি মেহনতি মানুষের সমর্থন অনুভব করে, তারাই ফ্যাসিবাদী দলগুলোকে সফলভাবে পরাস্ত করতে পারে। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম উদারনৈতিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে শুরু হয় না, শুরু হয় কারখানায় আর শেষ হয় রাজপথে। কারখানার ধর্মঘটভাঙা আর ভাড়াটে বন্দুকবাজেরাই ফ্যাসিবাদী বাহিনীর মূল কেন্দ্র। ধর্মঘটের পিকেটাররাই মজদুর বাহিনীর মূল কেন্দ্র। এটাই আমাদের যাত্রাবিন্দু। প্রতিটি ধর্মঘট ও রাজপথের বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য শ্রমিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা অপরিহার্য। এই স্লোগান ট্রেড ইউনিয়নের বিপ্লবী অংশের কর্মসূচিতে লিখে দিতে হবে। যেখানেই সম্ভব -যুব সংঘগুলো থেকে শুরু করে- আত্মরক্ষা দল গঠন করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অস্ত্র চালনার সঙ্গে পরিচিত করানো অপরিহার্য।

গণআন্দোলনের নতুন জোয়ারকে কাজে লাগাতে হবে শুধু এই দলগুলোর সংখ্যা বাড়াতেই নয়, পাড়া, শহর ও অঞ্চল অনুযায়ী তাদের ঐক্যবদ্ধ করতেও। ধর্মঘটভাঙা, গুন্ডাবাহিনী আর ফ্যাসিবাদীদের প্রতি শ্রমিকদের ন্যায্য ঘৃণাকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে। শ্রমিক সংগঠন, সভা-সমাবেশ ও সংবাদপত্রের নিরাপত্তার একমাত্র গুরুতর নিশ্চয়তা হিসেবে শ্রমিক মিলিশিয়ার স্লোগান তুলে ধরা প্রয়োজন।

কেবল এমন পরিকল্পিত, অবিচল, অক্লান্ত ও সাহসী প্রচার এবং সাংগঠনিক কাজের সাহায্যেই, সবসময় জনগণের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সম্ভব তাদের চেতনা থেকে বশ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার ঐতিহ্য উপড়ে ফেলা; সব মেহনতি মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে সক্ষম বীর যোদ্ধাদের বাহিনী গড়ে তোলা; প্রতিবিপ্লবের সশস্ত্র গুন্ডাদের একের পর এক কৌশলগত পরাজয় উপহার দেওয়া; শোষিত ও নিপীড়িতের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো; পেটি-বুর্জোয়াদের চোখে ফ্যাসিবাদকে হেয় করা এবং মজদুর শ্রেণির ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করা।

এঙ্গেলস রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন "সশস্ত্র মানুষের বাহিনী" হিসেবে। মজদুর শ্রেণির সশস্ত্রীকরণ তার মুক্তিসংগ্রামের এক অপরিহার্য সহগামী উপাদান। মজদুর শ্রেণি যখন তা চাইবে, তখন সশস্ত্র হওয়ার পথ ও উপায় সে নিজেই খুঁজে নেবে। এই ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোর ওপর বর্তায়।

শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী

গ্রামে মজদুরদের সহযোদ্ধা ও প্রতিরূপ হলো কৃষিশ্রমিক। তারা একই শ্রেণির দুটি অংশ। তাদের স্বার্থ অবিচ্ছেদ্য। শিল্পশ্রমিকদের অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি, এখানে-সেখানে কিছু রদবদলসহ, কৃষি-মজদুরদেরও কর্মসূচি।

কৃষকেরা আরেকটি শ্রেণির প্রতিনিধি: তারা গ্রামের পেটি-বুর্জোয়া। পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি নানা স্তর নিয়ে গঠিত, আধা-মজদুর থেকে শোষক উপাদান পর্যন্ত। সেই অনুযায়ী শিল্প-মজদুরদের রাজনৈতিক কর্তব্য হলো শ্রেণিসংগ্রামকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া। কেবল এভাবেই সে তার মিত্র আর শত্রুর মধ্যে বিভাজন রেখা টানতে পারবে।

প্রতিটি দেশের জাতীয় বিকাশের বিশেষত্বগুলো সবচেয়ে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পায় কৃষকদের অবস্থায়, এবং কিছুটা শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের (কারিগর ও দোকানদার) অবস্থায়। এই শ্রেণিগুলো সংখ্যায় যত বড়ই হোক, মূলত তারা প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-রূপের টিকে থাকা অবশেষ। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোকে প্রতিটি দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে, যথাসম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে, কৃষক ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের জন্য অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। অগ্রসর শ্রমিকদের শিখতে হবে তাদের ভবিষ্যৎ মিত্রদের প্রস্নের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে।

কৃষক যতদিন "স্বাধীন" ক্ষুদ্র উৎপাদক থাকে, ততদিন তার প্রয়োজন সস্তা ঋণ, সামর্থ্যের মধ্যে কৃষিযন্ত্র ও সার, অনুকূল পরিবহন-সুবিধা এবং তার কৃষিপণ্যের জন্য বাজারের বিবেকবান সংগঠন। কিন্তু ব্যাংক, ট্রাস্ট, বণিকেরা চারদিক থেকে কৃষককে লুট করে। কেবল কৃষকেরা নিজেরাই, শ্রমিকদের সহায়তায়, এই লুণ্ঠন ঠেকাতে পারে। ক্ষুদ্র কৃষকদের নির্বাচিত কমিটিগুলোকে জাতীয় মঞ্চে আবির্ভূত হতে হবে এবং শ্রমিক কমিটি ও ব্যাংক-কর্মচারীদের কমিটির সঙ্গে মিলে কৃষি-সংশ্লিষ্ট পরিবহন, ঋণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে হবে।

শ্রমিকদের "মাত্রাছাড়া" দাবির মিথ্যা দোহাই দিয়ে বৃহৎ বুর্জোয়ারা নিপুণভাবে পণ্যমূল্যের প্রশ্নকে এমন এক কীলকে পরিণত করে, যা ঠুকে দেওয়া হয় শ্রমিক আর কৃষকের মধ্যে, শ্রমিক আর শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে। কৃষক, কারিগর বা ছোট ব্যবসায়ী শিল্পশ্রমিক, অফিস ও সরকারি কর্মচারীদের মতো দাম বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলতে পারে না। দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে সরকারের আনুষ্ঠানিক লড়াই জনগণের সঙ্গে প্রতারণা মাত্র। কিন্তু কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীরা ভোক্তা হিসেবে শ্রমিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাম নির্ধারণের

রাজনীতিতে নামতে পারে। উৎপাদন, পরিবহন ও বাণিজ্যের খরচ নিয়ে পুঁজিপতির বিলাপের জবাবে ভোক্তারা বলে: "তোমাদের খাতা দেখাও; আমরা দাম নির্ধারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করি।" এই নিয়ন্ত্রণের সংস্থা হবে মূল্য কমিটি, যা গঠিত হবে কারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, কৃষক সংগঠন, শহরের "ছা-পোষা মানুষ", গ্রহিণী প্রমুখের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এর মাধ্যমে শ্রমিকেরা কৃষকদের কাছে প্রমাণ করতে পারবে যে চড়া দামের আসল কারণ উঁচু মজুরি নয়, বরং পুঁজিপতিদের আকাশছোঁয়া মুনাফা আর পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের বাড়তি খরচ।

ভূমি জাতীয়করণ ও কৃষির যৌথকরণের কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তার একেবারে ভিত্তিতেই ক্ষুদ্র কৃষকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও তাদের বাধ্যতামূলক যৌথকরণের সম্ভাবনা বাদ পড়ে যায়। কৃষক যতদিন নিজে সম্ভব বা প্রয়োজনীয় মনে করবে, ততদিন সে তার জমির মালিক থাকবে। কৃষকের চোখে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচির মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হলে যৌথকরণের স্থালিনপন্থী পদ্ধতিকে নির্মমভাবে উন্মোচন করা প্রয়োজন-যে পদ্ধতি কৃষক বা শ্রমিকের স্বার্থে নয়, আমলাতন্ত্রের স্বার্থে চালিত।

বাজেয়াপ্তকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের অর্থ-ও কারিগর ও দোকানদারদের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া নয়। উল্টো, ব্যাংক ও ট্রাস্টের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ- আরও বেশি করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের জন্য ঋণ, কেনা ও বেচার এমন অনুকূল শর্ত তৈরি করতে পারে, একচেটিয়াদের লাগামহীন আধিপত্যের অধীনে যার তুলনাই চলে না। ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর নির্ভরতার জায়গা নেবে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা; আর মেহনতি মানুষ যত দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রকে নিজেদের হাতে ধরে রাখবে, রাষ্ট্র তত বেশি মনোযোগী হবে তার ছোট সহযোগী ও প্রতিনিধিদের প্রয়োজনের প্রতি।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণে শোষিত কৃষকদের বাস্তব অংশগ্রহণই তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে দেবে- জমিতে যৌথ চাষে যাওয়া তাদের জন্য লাভজনক কি না, কবে এবং কী মাত্রায়। এই পথে চলতে কৃষকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করাকে শিল্পশ্রমিকদের নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করা উচিত: ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা কমিটি এবং সর্বোপরি শ্রমিক-কৃষক সরকারের মাধ্যমে।

মজদুর শ্রেণি যে মৈত্রীর প্রস্তাব দেয়- সাধারণভাবে "মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে" নয়, বরং শহর ও গ্রামের পেটি-বুর্জোয়াদের শোষিত স্তরগুলোকে, "মধ্যবিত্ত শ্রেণির" শোষকসহ সমস্ত শোষকের বিরুদ্ধে- তা জবরদস্তির ওপর নয়, দাঁড়াতে পারে কেবল স্বাধীন সম্মতির ওপর, যা একটি বিশেষ "চুক্তি"-তে পাকাপোক্ত করা উচিত। এই "চুক্তি" হলো উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় গৃহীত অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি।

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

গোটা বিশ্বপরিস্থিতি, আর সেই সূত্রে একক দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবনও, বিশ্বযুদ্ধের হুমকিতে মেঘাচ্ছন্ন। আসন্ন বিপর্যয় ইতিমধ্যেই মানবজাতির বিস্তৃততম জনগণের মধ্যে আশঙ্কার তীব্র কম্পন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ১৯১৪ সালের তার কুখ্যাত রাজনীতির পুনরাবৃত্তি করছে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, কারণ আজ উগ্র জাতীয়তাবাদের ঐকতানে প্রধান বাদকের আসনে বসে আছে কমিউটার্ন। যুদ্ধের বিপদ স্পষ্ট অবয়ব নিতেই স্থালিনপন্থীরা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের বহু পেছনে ফেলে তথাকথিত "জাতীয় প্রতিরক্ষা"র নির্লজ্জ ঢাকঢোল পেটানো বক্তায় পরিণত হলো। ফলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের পুরো ভার এসে পড়েছে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কাঁধে।

এই প্রস্নে বলশেভিক-লেনিনবাদী নীতি, যা আন্তর্জাতিক সচিবালয়ের থিসিসে (যুদ্ধ ও চতুর্থ আন্তর্জাতিক, ১৯৩৪) সূত্রবদ্ধ হয়েছে, আজও তার সম্পূর্ণ শক্তি বজায় রেখেছে।

আসন্ন পর্বে একটি বিপ্লবী পার্টির সাফল্য প্রধানত নির্ভর করবে যুদ্ধের প্রস্নে তার নীতির ওপর। সঠিক নীতি দুটি উপাদানে গঠিত: সাম্রাজ্যবাদ ও তার যুদ্ধের প্রস্নে আপসহীন অবস্থান, এবং জনগণের নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর নিজের কর্মসূচিকে দাঁড় করানোর সামর্থ্য।

বুর্জোয়ারা ও তাদের দালালেরা অন্য যেকোনো প্রস্নের চেয়ে বেশি যুদ্ধের প্রস্নকে ব্যবহার করে বিমূর্ত ধারণা, সাধারণ সূত্র আর খোঁড়া বুলির মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করতে: "নিরপেক্ষতা", "যৌথ প্রতিরক্ষা", "শান্তি রক্ষার জন্য অস্থগজ্জা", "ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" ইত্যাদি। এসব সূত্রের শেষ কথা একটাই: যুদ্ধের প্রস্ন, অর্থাৎ জনগণের ভাগ্য, ছেড়ে রাখা হয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে- তাদের শাসক কর্তব্যাক্তি, তাদের কূটনীতি, তাদের জেনারেলদের হাতে, জনগণের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রসমেত।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে এমন সব বিমূর্ত ধারণা, যা গণতান্ত্রিক শিবিরে ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করে, যা ফ্যাসিবাদী শিবিরে পালন করে "সম্মান", "রক্ত", "বর্ণ"। কিন্তু ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। যাচাইয়ের মাপকাঠি, শ্লোগান ও দাবির সাহায্যে জনগণকে এইসব প্রতারণাপূর্ণ বিমূর্ত ধারণার সুনির্দিষ্ট সারবস্তু চিনে নিতে সাহায্য করা অপরিহার্য।

"নিরস্ত্রীকরণ"?- কিন্তু গোটা প্রশ্নটা ঘোরে একটি কথাকে ঘিরে: কে কাকে নিরস্ত্র করবে। একমাত্র যে নিরস্ত্রীকরণ যুদ্ধ ঠেকাতে বা থামাতে পারে, তা হলো শ্রমিকদের হাতে বুর্জোয়াদের নিরস্ত্রীকরণ। কিন্তু বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করতে হলে শ্রমিকদের নিজেদের সশস্ত্র হতে হবে।

"নিরপেক্ষতা"?- কিন্তু জাপান ও চীনের যুদ্ধে, কিংবা জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে মজদুর শ্রেণি মোটেই নিরপেক্ষ নয়। "তাহলে কি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার কথা বলা হচ্ছে?" অবশ্যই! কিন্তু সেই সাম্রাজ্যবাদীদের দিয়ে নয়, যারা চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, দুটোকেই গলা টিপে মারবে।

"পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা"?- কিন্তু এই বিমূর্ত কথাটি দিয়ে বুর্জোয়ারা বোঝে তাদের মুনামা আর লুটের মালের প্রতিরক্ষা। আমরা বিদেশি পুঁজিপতিদের হাত থেকে পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে প্রস্তুত - যদি আগে আমরা আমাদের নিজেদের পুঁজিপতিদের হাত-পা বেঁধে ফেলি এবং অন্যের পিতৃভূমি আক্রমণ থেকে তাদের ঠেকাই; যদি আমাদের দেশের শ্রমিক ও কৃষকেরা তার প্রকৃত মালিক হয়ে ওঠে; যদি দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় এক সংখ্যালঘুর হাত থেকে জনগণের হাতে আসে; যদি সেনাবাহিনী শোষকের বদলে শোষিতের অস্ত্র হয়ে ওঠে।

এই মৌলিক ধারণাগুলোকে ঘটনাপ্রবাহ ও জনগণের চিন্তার গতিমুখ অনুযায়ী আরও সুনির্দিষ্ট ও আংশিক ধারণায় ভেঙে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া কূটনীতিক, অধ্যাপক, সাংবাদিকের শান্তিবাদ আর কাঠমিস্ত্রি, কৃষিশ্রমিক ও গৃহকর্মীর শান্তিবাদের মধ্যে কঠোর পার্থক্য টানা প্রয়োজন। এক ক্ষেত্রে শান্তিবাদ সাম্রাজ্যবাদের পর্দা; অন্য ক্ষেত্রে তা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অবিশ্বাসের বিভ্রান্ত প্রকাশ। ক্ষুদ্র কৃষক বা শ্রমিক যখন পিতৃভূমির প্রতিরক্ষার কথা বলে, তখন সে বোঝায় আগ্রাসন, বোমা আর বিষাক্ত গ্যাস থেকে তার ঘর, তার পরিবার এবং তার মতো অন্য পরিবারগুলোর প্রতিরক্ষা। পুঁজিপতি আর তার সাংবাদিক পিতৃভূমির প্রতিরক্ষা বলতে বোঝে উপনিবেশ ও বাজার দখল, বিশ্ব-আয়ে "জাতীয়" ভাগের লুটেরা বৃদ্ধি। বুর্জোয়া শান্তিবাদ ও দেশপ্রেম আগাগোড়া প্রতারণায় ভরা। নিপীড়িতের শান্তিবাদ, এমনকি দেশপ্রেমেও এমন উপাদান থাকে, যা একদিকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা, আর অন্যদিকে যাকে তারা নিজেদের কল্যাণ বলে মনে করে তাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা- প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এই উপাদানগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে জানতে হবে।

এই বিবেচনাগুলোকে যাত্রাবিন্দু ধরে চতুর্থ আন্তর্জাতিক প্রতিটি দাবিকে সমর্থন করে, তা অপরিহার্য হলেও, যদি তা জনগণকে কিছুটা হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে টেনে আনতে পারে, তাদের সমালোচনার চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে এবং বুর্জোয়াদের কারসাজির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে পারে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই, উদাহরণস্বরূপ, আমাদের আমেরিকান শাখা যুদ্ধ ঘোষণার প্রশ্নে গণভোটের প্রস্তাবকে সমালোচনামূলকভাবে সমর্থন করে। বলাই বাহুল্য, কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কার নিজে থেকে শাসকদের ইচ্ছামতো যুদ্ধ বাধানো ঠেকাতে পারে না। এ বিষয়ে খোলাখুলি সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রস্তাবিত গণভোট নিয়ে জনগণের মোহ থাকা সত্ত্বেও, এর প্রতি তাদের সমর্থন বুর্জোয়া সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি শ্রমিক ও কৃষকের অবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে। মোহকে সমর্থন না করে, আবার তাকে রেহাইও না দিয়ে, শোষকদের প্রতি শোষিতের প্রগতিশীল অবিশ্বাসকে সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করা প্রয়োজন। গণভোটের আন্দোলন যত ব্যাপক হবে, বুর্জোয়া শান্তিবাদীরা তত দ্রুত তা থেকে সরে পড়বে; কমিউটার্নের বিশ্বাসঘাতকেরা তত সম্পূর্ণভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবে; সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি অবিশ্বাস তত তীব্র হয়ে উঠবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দাবি তোলা প্রয়োজন: আঠারো বছর বয়স থেকে নারী-পুরুষ সবার ভোটাধিকার। কাল যাদের পিতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতে ডাকা হবে, আজ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে হবে সর্বাত্মক যুবসমাজের বিপ্লবী সমাবেশের মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধের সমস্যার ওপর সব দিক থেকে আলো ফেলতে হবে, নির্দিষ্ট মুহূর্তে কোন দিক থেকে তা জনগণের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে।

যুদ্ধ এক বিরাট বাণিজ্যিক উদ্যোগ, বিশেষত যুদ্ধশিল্পের জন্য। তাই "৬০ পরিবার" হলো সামনের সারির দেশপ্রেমিক এবং যুদ্ধের প্রধান উসকানিদাতা। যুদ্ধশিল্পের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণই যুদ্ধের "কারিগরদের" বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ।

সংস্কারবাদীদের স্লোগান, *যুদ্ধের মুনাফার ওপর কর* এর বিপরীতে আমরা তুলে ধরি এই স্লোগান: *যুদ্ধের মুনাফা বাজেয়াপ্ত করো, যুদ্ধশিল্পের কারবারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করো*। যেখানে সামরিক শিল্প "জাতীয়কৃত", যেমন ফ্রান্সে, সেখানেও শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের স্লোগান তার পূর্ণ শক্তি বজায় রাখে। বুর্জোয়া সরকারের ওপর মজদুর শ্রেণির আস্থা একক পুঁজিপতির ওপর আস্থার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি নয়।

বুর্জোয়া সরকারের জন্য একজন মানুষও নয়, একটি পয়সাও নয়!

অস্ত্রসজ্জার কর্মসূচি নয়, চাই জনকল্যাণমূলক গণপূর্ত কাজের কর্মসূচি!

সামরিক-পুলিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা চাই!

জনগণের পিঠের আড়ালে চক্রান্তরত লোভী ও নির্মম সাম্রাজ্যবাদী চক্রের হাত থেকে জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা আমাদের চিরতরে ছিনিয়ে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী আমরা দাবি করি:

- গোপন কূটনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ;
- সমস্ত চুক্তি ও সমঝোতা সব শ্রমিক ও কৃষকের জন্য উন্মুক্ত করা;
- শ্রমিক ও কৃষক কমিটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক ও কৃষকদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্রীকরণ;
- শ্রমিক সংগঠনগুলোর বাছাই করা মেহনতি মানুষের মধ্য থেকে সেনানায়ক তৈরির জন্য সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;
- স্থায়ী সেনাবাহিনীর বদলে কারখানা, খনি, খামার ইত্যাদির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত গণ-মিলিশিয়া।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বুর্জোয়াদের লুটেরা রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা ও তীব্রতর রূপ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে মজদুর শ্রেণির সংগ্রাম তার শ্রেণিসংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা ও তীব্রতর রূপ। যুদ্ধ শুরু হলে শ্রেণিগুলোর মধ্যকার সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং আংশিকভাবে তার উপায় বদলায়, কিন্তু লক্ষ্য ও মূল গতিপথ বদলায় না। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য করে। তাই মৌলিক চরিত্রে আসন্ন যুদ্ধ হবে একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ফলে আন্তর্জাতিক মজদুর শ্রেণির রাজনীতির মৌলিক বিষয়বস্তু হবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামে মূলনীতি হলো: "প্রধান শত্রু তোমার নিজের দেশেই" অথবা "তোমার নিজের (সাম্রাজ্যবাদী) সরকারের পরাজয়ই কম মন্দ।"

কিন্তু দুনিয়ার সব দেশ সাম্রাজ্যবাদী নয়। উল্টো, অধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদের শিকার। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ দেশগুলোর কোনো কোনোটি নিঃসন্দেহে যুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে দাসত্বের জোয়াল ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করবে। তাদের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী হবে না, হবে মুক্তিযুদ্ধ। নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত দেশগুলোর যুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে আন্তর্জাতিক মজদুর শ্রেণির কর্তব্য। একই কর্তব্য প্রযোজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে, কিংবা যুদ্ধের আগে বা যুদ্ধের মধ্যে গড়ে ওঠা অন্য যেকোনো শ্রমিক সরকারকে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও। শ্রমিক রাষ্ট্র বা কোনো ঔপনিবেশিক দেশের সঙ্গে সংঘাতে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয়ই কম মন্দ।

তবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শ্রমিকেরা নিজেদের সরকারের মাধ্যমে কোনো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশকে সাহায্য করতে পারে না, কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে দুই দেশের কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন। সরকারগুলো যদি সাময়িক, এবং ব্যাপারটার স্বভাবতই অনির্ভরযোগ্য, কোনো জোটে আবদ্ধ হয়, তবুও সাম্রাজ্যবাদী দেশের মজদুর শ্রেণি তার নিজের সরকারের বিরুদ্ধে শ্রেণিগত বিরোধিতায় অটল থাকে, এবং অসাম্রাজ্যবাদী "মিত্র" কে

সমর্থন করে নিজস্ব পদ্ধতিতে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রেণিসংগ্রামের পদ্ধতিতে (শুধু তাদের বিশ্বাসঘাতক মিত্রদের বিরুদ্ধেই নয়, কোনো ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক রাষ্ট্রের পক্ষেও প্রচার-আন্দোলন; এক ক্ষেত্রে বয়কট ও ধর্মঘট, অন্য ক্ষেত্রে বয়কট ও ধর্মঘট পরিহার, ইত্যাদি)।

যুদ্ধে ঔপনিবেশিক দেশ বা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করতে গিয়ে মজদুর শ্রেণি বিন্দুমাত্রও ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের থার্মিডোরীয় আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম হয় না। উল্টো, উভয়ের কাছ থেকেই সে পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখে। একটি ন্যায়সংগত ও প্রগতিশীল যুদ্ধে সাহায্য দিয়ে বিপ্লবী মজদুর শ্রেণি উপনিবেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকদের সহানুভূতি অর্জন করে, সেখানে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কর্তৃত্ব ও প্রভাব মজবুত করে, এবং ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতন্ত্রকে উৎখাতে সাহায্য করার সামর্থ্য বাড়ায়।

যুদ্ধের শুরুতে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলো অনিবার্যভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করবে: প্রতিটি যুদ্ধ জাতীয় জনগণকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে বসে এবং তাদের সরকারি যন্ত্রের দিকে ঠেলে দেয়। আন্তর্জাতিকতাবাদীদের স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে হবে। কিন্তু নতুন যুদ্ধ যে ধ্বংস আর দুর্দশা ডেকে আনবে, যা প্রথম কয়েক মাসেই ১৯১৪-১৮ সালের রক্তাক্ত বিভীষিকাকে বহু দূর ছাড়িয়ে যাবে, তা দ্রুতই মোহভঙ্গ ঘটাবে। জনগণের অসন্তোষ আর বিদ্রোহ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোকে দেখা যাবে বিপ্লবী জোয়ারের পুরোভাগে। অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি জ্বলন্ত প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করবে। মজদুর শ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন তার পূর্ণ অবয়বে সামনে এসে দাঁড়াবে।

মানবজাতিকে নিঃশেষ করা বা রক্তে ডুবিয়ে দেওয়ার আগে পুঁজিবাদ জাতিগত ও বর্ণগত ঘৃণার বিষাক্ত বাষ্প দুনিয়ার বাতাসকে কলুষিত করে। ইহুদিবিদ্বেষ আজ পুঁজিবাদের মৃত্যুযন্ত্রণার সবচেয়ে মারাত্মক খাঁচুনিগুলোর একটি।

বর্ণবিদ্বেষ এবং জাত্যভিমান ও উগ্র জাতীয়তাবাদের সব রূপ ও ছায়ার, বিশেষত ইহুদিবিদ্বেষের, শিকড়ের আপসহীন উন্মোচনকে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সব শাখার দৈনন্দিন কাজের অংশ করে তুলতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। আমাদের মূল স্লোগান আগের মতোই: *দুনিয়ার মজদুর, এক হও!*

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রমিক-কৃষক সরকার

"শ্রমিক-কৃষক সরকার", এই সূত্রটি প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের প্রচার-আন্দোলনে, এবং অক্টোবর বিপ্লবের পর তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। শেষ বিচারে এটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মজদুর একনায়কত্বের জনপ্রিয় নাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই নামকরণের তাৎপর্য প্রধানত এই যে, এটি মজদুর শ্রেণি ও কৃষকসমাজের মৈত্রীর ধারণাকে জোর দিয়ে তুলে ধরেছিল, যার ওপর সোভিয়েত ক্ষমতা দাঁড়িয়ে আছে।

এপিগোনদের [অযোগ্য উত্তরসূরিদের] কমিন্টার্ন যখন ইতিহাসের কবরে চাপা পড়া "মজদুর ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" এর সূত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করল, তখন সে "শ্রমিক-কৃষক সরকার" এর সূত্রকে দিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, নিছক "গণতান্ত্রিক", অর্থাৎ বুর্জোয়া বিষয়বস্তু, এবং তাকে দাঁড় করাল মজদুর একনায়কত্বের বিপরীতে। বলশেভিক-লেনিনবাদীরা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্করণের "শ্রমিক-কৃষক সরকার" এর স্লোগান দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা তখন জোর দিয়ে বলেছিলেন, এবং এখনো বলেন: মজদুর শ্রেণির পার্টি যখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সীমা পেরোতে অস্বীকার করে, তখন কৃষকসমাজের সঙ্গে তার মৈত্রী স্বেচ্ছা পুঁজির খুঁটিতে পরিণত হয়, যেমনটা ঘটেছিল ১৯১৭ সালে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনারিদের (এসআর) ক্ষেত্রে, ১৯২৫-২৭ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে, এবং যেমনটা এখন ঘটছে স্পেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের "গণফ্রন্ট" এর ক্ষেত্রে।

১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বলশেভিকেরা দাবি করেছিলেন, এসআর ও মেনশেভিকেরা উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিক। এই শর্তে বলশেভিক পার্টি মেনশেভিক ও এসআরদের, শ্রমিক ও কৃষকের পেটি-বুর্জোয়া প্রতিনিধি হিসেবে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; তবে মেনশেভিক ও এসআরদের সরকারে যোগ দিতে কিংবা সেই সরকারের রাজনৈতিক দায় বহন করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেছিল। মেনশেভিক ও এসআরেরা যদি সত্যিই ক্যাডেটদের [উদারনৈতিকদের] সঙ্গে এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করত, তবে তাদের গড়া "শ্রমিক-কৃষক সরকার" কেবল মজদুর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত ও সহজতর করত। কিন্তু ঠিক এই কারণেই পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নেতৃত্ব নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েছিল। রাশিয়ার

অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, আর স্পেন ও ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা আবার প্রমাণ করছে: খুব অনুকূল পরিস্থিতিতেও পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পার্টিগুলো (এসআর, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, স্টালিনপন্থী, নৈরাজ্যবাদী) শ্রমিক-কৃষক সরকার, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের থেকে স্বাধীন সরকার গঠনে অক্ষম।

তবু মেনশেভিক ও এসআরদের উদ্দেশ্যে বলশেভিকদের দাবি, "বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো, ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নাও!", জনগণের কাছে বিপুল শিক্ষামূলক তাৎপর্য বহন করেছিল। ক্ষমতা নিতে মেনশেভিক ও এসআরদের একগুঁয়ে অনিচ্ছা, যা জুলাইয়ের দিনগুলোতে এত নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছিল, জনমতের সামনে তাদের চূড়ান্তভাবে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং বলশেভিকদের বিজয়ের পথ তৈরি করেছিল।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হলো মজদুর শ্রেণিকে সেই পুরোনো নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করা, যার রক্ষণশীলতা ভেঙে পড়া পুঁজিবাদের বিপর্যয়কর বিস্ফোরণগুলোর সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং যা ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। মজদুর শ্রেণির প্রচলিত সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের প্রধান অভিযোগ হলো, তারা বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক আধমরা লাশ থেকে নিজেদের ছিঁড়ে আলাদা করতে চায় না। এই পরিস্থিতিতে পুরোনো নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে তোলা দাবি, "বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো, ক্ষমতা নাও!", দ্বিতীয়, তৃতীয় ও আমস্টারডাম আন্তর্জাতিকের পার্টি ও সংগঠনগুলোর বিশ্বাসঘাতক চরিত্র উন্মোচনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই "শ্রমিক-কৃষক সরকার" এর স্লোগান আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কেবল সেই অর্থে, যে অর্থে ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের কাছে তা ছিল, অর্থাৎ একটি বুর্জোয়াবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী স্লোগান হিসেবে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সেই "গণতান্ত্রিক" অর্থে নয়, যা পরে এপিগোনরা তাকে দিয়েছিল, এবং যার মাধ্যমে তারা একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সেতু থেকে তার পথের প্রধান প্রতিবন্ধকে পরিণত করেছিল।

যেসব পার্টি ও সংগঠন শ্রমিক ও কৃষকের ওপর ভর করে দাঁড়ায় এবং তাদের নামে কথা বলে, তাদের সবার কাছে আমরা দাবি করি: তারা রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং শ্রমিক-কৃষক সরকারের জন্য সংগ্রামের পথে নামুক। এই পথে আমরা পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিই। একই সঙ্গে আমরা অক্লান্তভাবে সেইসব অন্তর্বর্তীমূলক দাবিকে ঘিরে প্রচার-আন্দোলন চালিয়ে যাই, যা আমাদের মতে শ্রমিক-কৃষক সরকারের কর্মসূচি হওয়া উচিত।

প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষে কি এমন সরকার গঠন সম্ভব? অতীতের অভিজ্ঞতা দেখায়, যেমন আগেই বলা হয়েছে, এটা অন্তত অত্যন্ত অসম্ভাব্য। তবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির (যুদ্ধ, পরাজয়, আর্থিক ধস, বিপ্লবী গণচাপ ইত্যাদি) প্রভাবে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলো, স্টালিনপন্থীসহ, বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে নিজেদের

ইচ্ছার চেয়েও বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে, এই তাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে আগেভাগে সুনিশ্চিতভাবে অস্বীকার করা যায় না। যা-ই হোক, একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: এই অত্যন্ত অসম্ভাব্য বিকল্পটি যদি কোথাও, কোনো এক সময়ে বাস্তবে রূপ নেয় এবং উল্লিখিত অর্থে "শ্রমিক-কৃষক সরকার" সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা প্রকৃত মজদুর একনায়কত্বের পথে একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র হবে।

তবে অনুমানের খেলায় মেতে ওঠার প্রয়োজন নেই। শ্রমিক-কৃষক সরকারের স্লোগানকে ঘিরে প্রচার-আন্দোলন সব পরিস্থিতিতেই বিপুল শিক্ষামূলক মূল্য বহন করে। আর তা কাকতালীয় নয়। এই সাধারণীকৃত স্লোগানটি পুরোপুরি আমাদের যুগের রাজনৈতিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করে (পুরোনো বুর্জোয়া পার্টিগুলোর দেউলিয়াত্ব ও পচন, গণতন্ত্রের পতন, ফ্যাসিবাদের উত্থান, আরও সক্রিয় ও আক্রমণাত্মক রাজনীতির দিকে শ্রমিকদের দ্রুততর অভিযাত্রা)। তাই প্রতিটি অন্তর্বর্তীমূলক দাবিকে একই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে হবে: কৃষকদের সঙ্গে মিলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের বুর্জোয়াদের সব প্রচলিত পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

জনগণের বিপ্লবী সমাবেশের সুনির্দিষ্ট পর্যায়গুলো কেমন হবে, তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোকে প্রতিটি নতুন পর্যায়ে সমালোচনামূলকভাবে নিজেদের দিশা ঠিক করে নিতে হবে এবং এমন স্লোগান তুলতে হবে, যা স্বাধীন রাজনীতির জন্য শ্রমিকদের প্রয়াসকে এগিয়ে দেবে, সেই রাজনীতির শ্রেণিচরিত্রকে গভীর করবে, সংস্কারবাদী ও শান্তিবাদী মোহ ভেঙে দেবে, জনগণের সঙ্গে অগ্রবাহিনীর বন্ধন দৃঢ় করবে এবং বিপ্লবী পথে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি নেবে।

সোভিয়েত

কারখানা কমিটি, যেমন আগেই বলা হয়েছে, কারখানার ভেতরে দ্বৈত ক্ষমতার উপাদান। ফলে তাদের অস্তিত্ব সম্ভব কেবল জনগণের ক্রমবর্ধমান চাপের পরিস্থিতিতে। একই কথা প্রযোজ্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গড়ে ওঠা বিশেষ গণসংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে, মূল্য কমিটিগুলোর ক্ষেত্রে এবং আন্দোলনের অন্য সব নতুন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে, যাদের আবির্ভাবই সাক্ষ্য দেয় যে শ্রেণিসংগ্রাম মজদুর শ্রেণির প্রচলিত সংগঠনগুলোর সীমা উপচে পড়েছে।

তবে এই নতুন সংস্থা ও কেন্দ্রগুলো শিগগিরই তাদের সংহতির অভাব আর অপরিপূর্ণতা টের পেতে শুরু করবে। বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে একটিও অন্তর্বর্তীমূলক দাবি পুরোপুরি পূরণ করা যায় না। একই সঙ্গে সামাজিক সংকট যত গভীর হবে, জনগণের দুর্ভোগই শুধু নয়, তাদের অধৈর্য, নাছোড় জেদ আর চাপও তত বাড়বে। নিপীড়িতদের নতুন নতুন স্তর মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং নিজেদের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসবে। সংস্কারবাদী নেতারা যাদের কথা কখনো ভাবেননি, সেই লক্ষ লক্ষ খেটে-খাওয়া "ছা-পোষা মানুষ" শ্রমিক সংগঠনগুলোর দরজায় অবিরাম কড়া নাড়তে শুরু করবে। বেকারেরা আন্দোলনে যোগ দেবে। কৃষিশ্রমিক, সর্বস্বান্ত ও আধা-সর্বস্বান্ত কৃষক, শহরের নিপীড়িত মানুষ, নারী শ্রমিক, গৃহিণী, বুদ্ধিজীবীদের মজদুরয় পরিণত স্তর- এরা সবাই ঐক্য ও নেতৃত্ব খুঁজবে।

বিভিন্ন দাবি আর সংগ্রামের বিভিন্ন রূপকে কীভাবে সমন্বিত করা যাবে, এমনকি একটি শহরের সীমার মধ্যেও? ইতিহাস ইতিমধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে: সোভিয়েতের মাধ্যমে। সোভিয়েত সব সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের একত্র করবে। এই উদ্দেশ্যে কেউ এখন পর্যন্ত ভিন্ন কোনো সাংগঠনিক রূপের প্রস্তাব দেয়নি; সত্যি বলতে, এর চেয়ে ভালো কিছু ভেবে বের করাও প্রায় অসম্ভব। সোভিয়েত কোনো পূর্বনির্ধারিত পার্টি-কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ নয়। সব শোষিতের জন্য সে তার দরজা হাট করে খুলে দেয়। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সংগ্রামের সাধারণ স্রোতে টানা পড়া সব স্তরের প্রতিনিধি। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হতে থাকা এই সংগঠন নিজের গর্ভেই বারবার নবায়িত হয়। মজদুর শ্রেণির সব রাজনৈতিক ধারা ব্যাপকতম গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সোভিয়েতের নেতৃত্বের জন্য লড়তে পারে। তাই সোভিয়েতের স্লোগানই অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচির মুকুট।

সোভিয়েতের উদ্ভব হতে পারে কেবল তখনই, যখন গণআন্দোলন খোলাখুলি বিপ্লবী পর্যায়ে প্রবেশ করে। আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই সোভিয়েত, শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ যাকে ঘিরে

ঐক্যবদ্ধ হয়, সেই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, প্রথমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের, তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। কারখানা কমিটি যদি কারখানায় দ্বৈত ক্ষমতা সৃষ্টি করে, তবে সোভিয়েত গোটা দেশে দ্বৈত ক্ষমতার এক পর্বের সূচনা করে।

দ্বৈত ক্ষমতা আবার অন্তর্বর্তীকালীন পর্বের চূড়ান্ত বিন্দু। দুটি শাসনব্যবস্থা, বুর্জোয়া ও মজদুর, আপসহীনভাবে পরস্পরের মুখোমুখি। তাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। সমাজের ভাগ্য নির্ভর করে তার পরিণতির ওপর। বিপ্লব পরাজিত হলে আসবে বুর্জোয়াদের ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব। বিজয়ী হলে উদ্ভব ঘটবে সোভিয়েতের ক্ষমতার, অর্থাৎ মজদুর একনায়কত্বের এবং সমাজের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের।

পশ্চাৎপদ দেশ ও অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলো তাদের সারবস্তুতেই পশ্চাৎপদ দেশ। কিন্তু পশ্চাৎপদ দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত এক দুনিয়ার অংশ। তাই তাদের বিকাশের চরিত্র সম্মিলিত: সবচেয়ে আদিম অর্থনৈতিক রূপ মিশে যায় পুঁজিবাদী প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির সর্বাধুনিক রূপের সঙ্গে। একইভাবে নির্ধারিত হয় পশ্চাৎপদ দেশগুলোর মজদুর শ্রেণির রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা: জাতীয় স্বাধীনতা ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সবচেয়ে প্রাথমিক অর্জনের সংগ্রাম মিশে যায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে। এই সংগ্রামে গণতান্ত্রিক স্লোগান, অন্তর্বর্তীমূলক দাবি আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্যাগুলো আলাদা আলাদা ঐতিহাসিক যুগে ভাগ করা নয়, বরং সরাসরি একটি থেকে আরেকটি উৎসারিত। চীনের মজদুর শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে শুরু করতে না করতেই তাকে সোভিয়েতের কথা ভাবতে হয়েছিল। এই অর্থে বর্তমান কর্মসূচি ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য, অন্তত সেসব দেশে, যেখানে মজদুর শ্রেণি স্বাধীন রাজনীতি চালানোর সামর্থ্য অর্জন করেছে।

ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলোর কেন্দ্রীয় কর্তব্য হলো কৃষি বিপ্লব, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক উত্তরাধিকারের অবসান, এবং জাতীয় স্বাধীনতা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী জোয়ালের উৎখাত। দুটি কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে স্বেচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব; প্রয়োজন হলো, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ যেন তাকে ছাড়িয়ে যায়। জাতীয় পরিষদ (বা গণপরিষদ) এর স্লোগান চীন বা ভারতের মতো দেশে তার পূর্ণ শক্তি বজায় রাখে। এই স্লোগানকে জাতীয় মুক্তি ও কৃষি সংস্কারের সমস্যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বেঁধে দিতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্রমিকদের এই গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে সজ্জিত করতে হবে। কেবল তারাই কৃষকদের ডাক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে শ্রমিকদের "জাতীয়" বুর্জোয়াদের বিপরীতে দাঁড় করাতে হবে। তারপর বিপ্লবী গণতন্ত্রের স্লোগানে জনগণের সমাবেশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সোভিয়েতের উদ্ভব হতে পারে এবং হওয়া উচিত। প্রতিটি নির্দিষ্ট পর্বে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশেষত জাতীয় পরিষদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, নির্ধারিত হবে মজদুর শ্রেণির রাজনৈতিক মান, কৃষকসমাজের সঙ্গে তার বন্ধন এবং মজদুর পার্টির নীতির চরিত্র দিয়ে। আগে হোক বা পরে, সোভিয়েতকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে উৎখাত করতে হবে। কেবল তারাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পরিণতিতে পৌঁছে দিতে এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক যুগের দুয়ার খুলে দিতে সক্ষম।

মজদুর শ্রেণির সংগ্রামে একক গণতান্ত্রিক ও অন্তর্বর্তীমূলক দাবিগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সেগুলো তুলে ধরার ক্রম নির্ধারিত হয় প্রতিটি পশ্চাৎপদ দেশের বিশেষত্ব ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি দিয়ে, এবং অনেকাংশে তার পশ্চাৎপদতার মাত্রা দিয়ে। তবু সব পশ্চাৎপদ দেশে বিপ্লবী বিকাশের সাধারণ ধারা নির্ধারণ করা যায় স্থায়ী বিপ্লবের (পার্মানেন্ট রেভলুশন) সূত্র দিয়ে, রাশিয়ার তিনটি বিপ্লব (১৯০৫, ফেব্রুয়ারি ১৯১৭, অক্টোবর ১৯১৭) সেই সূত্রকে যে সুনির্দিষ্ট অর্থ দিয়েছে, সেই অর্থে।

একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় বিপ্লবকে কীভাবে ধ্বংস করা যায়, কমিন্টার্ন পশ্চাৎপদ দেশগুলোকে তার এক ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছে। ১৯২৫-২৭ সালে চীনে ঝোড়ো গণজাগরণের সময় কমিন্টার্ন জাতীয় পরিষদের স্লোগান তুলতে ব্যর্থ হয়, আবার একই সঙ্গে সোভিয়েত গঠন নিষিদ্ধ করে। (স্তালিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বুর্জোয়া পার্টি কুয়োমিনতাংয়েরই জাতীয় পরিষদ ও সোভিয়েত, দুটোরই জায়গা নেওয়ার কথা ছিল।) কুয়োমিনতাং জনগণকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর কমিন্টার্ন ক্যান্টনে সোভিয়েতের এক ব্যঙ্গচিত্র খাড়া করে। ক্যান্টন অভ্যুত্থানের অনিবার্য পতনের পর কমিন্টার্ন ধরে গেরিলা যুদ্ধ আর কৃষক সোভিয়েতের পথ, অথচ শিল্প-মজদুর থেকে যায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। এভাবে কানাগলিতে গিয়ে ঠেকে কমিন্টার্ন চীন-জাপান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কলমের এক খোঁচায় "সোভিয়েত চীন" এর বিলুপ্তি ঘটায়, এবং শুধু কৃষকদের "লাল ফৌজ" কেই নয়, তথাকথিত "কমিউনিস্ট" পার্টিকেও সেই একই কুয়োমিনতাং, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের অধীন করে দেয়।

"গণতান্ত্রিক" দাসমালিকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে আন্তর্জাতিক মজদুর বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর কমিন্টার্ন একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা না করে পারেনি, এবং তা করেছে তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের চেয়েও বেশি নিরলসতার সঙ্গে। গণফ্রন্ট ও "জাতীয় প্রতিরক্ষা"-র রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য হলো কোটি কোটি ঔপনিবেশিক মানুষকে "গণতান্ত্রিক" সাম্রাজ্যবাদের কামানের খোরাকে পরিণত করা। যে পতাকায় জ্বলজ্বল করছে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর, অর্থাৎ মানবজাতির পুরো অর্ধেকের, মুক্তিসংগ্রাম, তা চূড়ান্তভাবে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের হাতে চলে এসেছে।

ফ্যাসিবাদী দেশে অন্তর্বর্তীমূলক দাবির কর্মসূচি

কমিন্টার্নের রণনীতিবিদেরা যখন হিটলারের বিজয়কে থেলমানের বিজয়ের পথে একটি ধাপ মাত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই সময় থেকে আজ আমরা বহু দূরে। থেলমান পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে হিটলারের কারাগারে। মুসোলিনি ষোলো বছরেরও বেশি সময় ধরে ইতালিকে ফ্যাসিবাদের শিকলে বেঁধে রেখেছে। এই পুরো সময়জুড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলো শুধু গণআন্দোলন পরিচালনায় নয়, এমনকি একটি গুরুতর গোপন সংগঠন গড়ে তুলতেও অক্ষম থেকেছে, জারতন্ত্রের (Tsardom) যুগের রুশ বিপ্লবী পার্টিগুলোর সঙ্গে কিছুটা হলেও তুলনীয় কোনো সংগঠনও তারা গড়তে পারেনি।

এই ব্যর্থতাকে ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। (আসলে মুসোলিনি কখনো কোনো মতাদর্শই হাজির করেনি।) হিটলারের "মতাদর্শ" কখনো শ্রমিকদের সত্যিকার অর্থে আঁকড়ে ধরেনি। জনগণের যেসব স্তর একসময় ফ্যাসিবাদের নেশায় মাতাল হয়েছিল, অর্থাৎ প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, নেশা কাটানোর যথেষ্ট সময় তারা পেয়েছে। কিছুটা লক্ষণীয় বিরোধিতা যে কেবল প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক গির্জা-মহলেই সীমাবদ্ধ, তার ব্যাখ্যা "বর্ণ" আর "রক্ত"-এর আধা-প্রলাপ ও আধা-হাতুড়ে তত্ত্বের শক্তিতে নয়, বরং গণতন্ত্র, সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ও কমিন্টার্নের মতাদর্শের ভয়াবহ ধসে।

প্যারিস কমিউনের গণহত্যার পর প্রায় আট বছর কালো প্রতিক্রিয়া রাজত্ব করেছিল। ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের পর মেহনতি জনগণ প্রায় ততদিনই স্তম্ভিত হয়ে ছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ছিল কেবল শারীরিক পরাজয়ের, যা নির্ধারিত হয়েছিল শক্তির ভারসাম্য দিয়ে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে, তা ছাড়া, প্রশ্নটা ছিল প্রায় আনকোরা এক মজদুর শ্রেণির। বলশেভিক উপদল তখনো তার তৃতীয় জন্মদিনও পালন করেনি। জার্মানিতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেখানে নেতৃত্ব এসেছিল শক্তিশালী পার্টিগুলো থেকে, যাদের একটির বয়স সত্তর বছর ও অন্যটির প্রায় পনেরো। লক্ষ লক্ষ ভোটারের সমর্থনপুষ্ট এই দুই পার্টিই লড়াইয়ের আগেই নৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছিল। ইতিহাসে এমন বিপর্যয়ের দ্বিতীয় নজির নেই। জার্মান মজদুর শ্রেণিকে শত্রু যুদ্ধক্ষেত্রে চূর্ণ করেনি। তাকে পিষে ফেলেছে তার নিজের পার্টিগুলোর কাপুরুষতা, হীনতা আর বিশ্বাসঘাতকতা।

তাই এতে বিশ্বাসের কিছু নেই যে প্রায় তিন প্রজন্ম ধরে যা কিছুতে সে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত ছিল, তার সবকিছুর ওপর থেকে সে আস্থা হারিয়েছে। হিটলারের বিজয় আবার মুসোলিনিকে শক্তিশালী করেছে।

স্পেন বা জার্মানিতে বিপ্লবী কাজের দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতা সোশ্যাল ডেমোক্রেসি ও কমিউনিস্টের অপরাধী রাজনীতিরই প্রতিফল। গোপন কাজের জন্য শুধু জনগণের সহানুভূতিই নয়, প্রয়োজন তাদের অগ্রসর স্তরের সচেতন উদ্দীপনা। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেউলিয়া সংগঠনগুলোর জন্য কি উদ্দীপনা আশা করা যায়? যারা প্রবাসী নেতা হিসেবে সামনে আসে, তাদের অধিকাংশই হয় হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত মনোবলহীন, ক্রেমলিন আর জিপিইউ-র দালাল, নয়তো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট সাবেক মন্ত্রী, যারা স্বপ্ন দেখে, শ্রমিকেরা কোনো অলৌকিক উপায়ে তাদের হারানো পদে ফিরিয়ে দেবে। এই মহাশয়দের কি এক মুহূর্তের জন্যও ভবিষ্যৎ "ফ্যাসিবাদবিরোধী" বিপ্লবের নেতার ভূমিকায় কল্পনা করা সম্ভব?

আর বিশ্বমঞ্চের ঘটনাবলি- অস্ট্রিয়ার শ্রমিকদের চূর্ণ হওয়া, স্পেনীয় বিপ্লবের পরাজয়, সোভিয়েত রাষ্ট্রের অধঃপতন- ইতালি ও জার্মানিতে বিপ্লবী জাগরণে কোনো সহায়তা দিতে পারেনি। জার্মান ও ইতালীয় শ্রমিকেরা যেহেতু রাজনৈতিক খবরের জন্য অনেকাংশে রেডিওর ওপর নির্ভরশীল, তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মস্কোর রেডিও স্টেশন, থার্মিডোরীয় মিথ্যার সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা আর ঔদ্ধত্য মিশিয়ে, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙার সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই, স্থালিন গোয়েবলসের সহকারীর কাজই করছে।

একই সঙ্গে যে শ্রেণিবৈরিতা ফ্যাসিবাদের বিজয় ঘটিয়েছিল, ফ্যাসিবাদের অধীনেও তা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে তার ভিত ক্ষয় করছে। জনগণ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট। শত শত, হাজার হাজার আত্মত্যাগী শ্রমিক সবকিছু সত্ত্বেও গোপনে বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এক নতুন প্রজন্ম সামনে এসেছে, যারা পুরোনো ঐতিহ্য এবং উচ্চাশা ভেঙে পড়া সরাসরি নিজেরা দেখেনি। সর্বগ্রাসী শাসনের ভারী সমাধিপ্রস্তরের নিচে অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে চলেছে মজদুর বিপ্লবের আণবিক প্রস্তুতি। কিন্তু লুকোনো শক্তিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে হলে মজদুর অগ্রবাহিনীকে খুঁজে পেতে হবে নতুন দিগন্ত, নতুন কর্মসূচি এবং এক নতুন, নিষ্কলঙ্ক পতাকা।

এখানেই প্রধান প্রতিবন্ধকতা। ফ্যাসিবাদী দেশের শ্রমিকদের পক্ষে নতুন কর্মসূচি বেছে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কর্মসূচি যাচাই হয় অভিজ্ঞতায়। আর সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রের দেশগুলোতে ঠিক গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতারই অভাব। খুবই সম্ভব যে ফ্যাসিবাদী ভূখণ্ডে বিপ্লবী আন্দোলনে গতি সঞ্চারের জন্য "গণতান্ত্রিক" দেশগুলোর কোনো

একটিতে মজদুর শ্রেণির একটি প্রকৃত সাফল্য প্রয়োজন হবে। কোনো আর্থিক বা সামরিক বিপর্যয়ের মাধ্যমেও একই প্রভাব সম্ভব। বর্তমানে প্রধানত প্রচারমূলক, প্রস্তুতিমূলক কাজ চালানো অপরিহার্য, যার বড় ফল মিলবে কেবল ভবিষ্যতে। একটা কথা এখনই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়: একবার বাঁধ ভাঙলে ফ্যাসিবাদী দেশগুলোতে বিপ্লবী চেউ তৎক্ষণাৎ বিশাল ব্যাপ্তি নেবে, এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো এক ওয়াইমার-লাশকে পুনরুজ্জীবিত করার পরীক্ষায় থেমে থাকবে না।

ঠিক এই বিন্দু থেকেই চতুর্থ আন্তর্জাতিক আর সেইসব পুরোনো পার্টির মধ্যে আপসহীন বিভাজন শুরু হয়, যারা নিজেদের দেউলিয়াত্বের পরেও টিকে থাকে। প্রবাসী "গণফ্রন্ট" সম্ভাব্য সব গণফ্রন্টের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও বিশ্বাসঘাতক রূপ। সারকথায় এটি এক অস্তিত্বহীন উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট বাঁধার অক্ষম আকুতি। সফল হলে এটি মজদুর শ্রেণির জন্য স্পেনীয় ধাঁচের একের পর এক নতুন পরাজয়ই প্রস্তুত করত। তাই "গণফ্রন্ট" এর তত্ত্ব ও প্রয়োগের নির্মম উন্মোচনই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম শর্ত।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে চতুর্থ আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার উপায় হিসেবে গণতান্ত্রিক স্লোগান প্রত্যাখ্যান করে। উল্টো, নির্দিষ্ট মুহূর্তে এমন স্লোগান গুরুতর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের সূত্রগুলো (সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ইত্যাদি) আমাদের কাছে মজদুর শ্রেণির স্বাধীন আন্দোলনে নিছক আনুষঙ্গিক বা সাময়িক স্লোগান মাত্র, বুর্জোয়াদের দালালদের হাতে মজদুর শ্রেণির গলায় পরানো কোনো গণতান্ত্রিক ফাঁস নয় (স্পেন!)। আন্দোলন যখনই কিছুটা গণচরিত্র নেবে, গণতান্ত্রিক স্লোগান মিশে যাবে অন্তর্বর্তীমূলক স্লোগানের সঙ্গে; ধরে নেওয়া যায়, পুরোনো গতানুগতিকেরা তাদের দপ্তর থেকে ছুটে এসে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার আগেই কারখানা কমিটিগুলো আবির্ভূত হবে; ওয়াইমারে নতুন গণপরিষদ বসার আগেই গোটা জার্মানি ছেয়ে যাবে সোভিয়েতে। একই কথা প্রযোজ্য ইতালি এবং অন্যান্য সর্বগ্রাসী ও আধা-সর্বগ্রাসী দেশের ক্ষেত্রে।

ফ্যাসিবাদ এই দেশগুলোকে রাজনৈতিক বর্বরতায় নিষ্ক্ষেপ করেছে। কিন্তু তাদের সামাজিক কাঠামো বদলায়নি। ফ্যাসিবাদ লগ্নিপুঁজির হাতের হাতিয়ার, সামন্ত ভূস্বামীদের নয়। বিপ্লবী কর্মসূচিকে দাঁড়াতে হবে শ্রেণিসংগ্রামের দ্বন্দ্বিকতার ওপর, যা ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রেও সমানভাবে খাটে, আতঙ্কিত দেউলিয়াদের মনস্তত্ত্বের ওপর নয়। চতুর্থ আন্তর্জাতিক ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে রাজনৈতিক ছদ্মবেশের সেই পথ, যা "তৃতীয় পর্ব" এর একদা বীর স্থালিনপন্থীদের পালাক্রমে ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট, ইহুদি, জার্মান জাতীয়তাবাদী, উদারপন্থীর মুখোশ পরে হাজির হতে প্ররোচিত করেছে, কেবল নিজেদের কুৎসিত চেহারা লুকানোর জন্য। চতুর্থ আন্তর্জাতিক সবসময়, সর্বত্র নিজের পতাকার নিচেই আবির্ভূত হয়। ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর মজদুর শ্রেণির সামনে সে খোলাখুলি তার

নিজস্ব কৰ্মসূচি তুলে ধৰে। সারা দুনিয়ার অগ্ৰসৰ শ্ৰমিকেৰা ইতিমধ্যেই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে যে মুসোলিনি, হিটলাৰ
এবং তাদেৰ দালাল ও অনুকৰণকাৰীদেৰ উৎখাত ঘটবে কেবল চতুৰ্থ আন্তৰ্জাতিকেৰ নেতৃত্বেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্তর্বর্তীকালীন যুগের সমস্যা

অক্টোবর বিপ্লব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল একটি শ্রমিক রাষ্ট্র হিসেবে। উৎপাদন-উপায়ের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যা সমাজতান্ত্রিক বিকাশের এক আবশ্যিক পূর্বশর্ত, উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু একই সময়ে শ্রমিক রাষ্ট্রের যন্ত্র সম্পূর্ণ অধঃপতনের শিকার হয়: শ্রমিক শ্রেণির হাতিয়ার থেকে তা পরিণত হয় শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিক সহিংসতার হাতিয়ারে, এবং ক্রমেই আরও বেশি করে দেশের অর্থনীতিতে অন্তর্ঘাতের হাতিয়ারে। একটি পশ্চাৎপদ ও বিচ্ছিন্ন শ্রমিক রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রীকরণ এবং আমলাতন্ত্রের এক সর্বশক্তিমান সুবিধাভোগী জাতে রূপান্তর "এক দেশে সমাজতন্ত্র" এর তত্ত্বের সবচেয়ে অকাট্য খণ্ডন- শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, এবার ব্যবহারিকভাবেও।

এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভয়াবহ সব দ্বান্দ্বিক বিরোধ ধারণ করে আছে। কিন্তু তা এখনো একটি অধঃপতিত শ্রমিক রাষ্ট্র। এই হলো সামাজিক রোগনির্ণয়। রাজনৈতিক পূর্বাভাসের চরিত্র বিকল্পমূলক: হয় আমলাতন্ত্র, শ্রমিক রাষ্ট্রের ভেতরে ক্রমেই আরও বেশি করে বিশ্ব বুর্জোয়াদের যন্ত্র হয়ে উঠে, সম্পত্তির নতুন রূপগুলোকে উৎখাত করবে এবং দেশকে আবার পুঁজিবাদে ঠেলে দেবে; নয়তো শ্রমিক শ্রেণি আমলাতন্ত্রকে চূর্ণ করে সমাজতন্ত্রের পথ খুলে দেবে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোর কাছে মস্কো বিচারগুলো [Moscow Trials] কোনো বিস্ময় হয়ে আসেনি, ক্রেমলিনের একনায়কের ব্যক্তিগত উন্মত্ততার ফল হিসেবেও নয়, বরং এসেছে থার্মিডোরের বৈধ সন্তান হিসেবে। এগুলো জন্ম নিয়েছে সোভিয়েত আমলাতন্ত্রের নিজের ভেতরকার অসহনীয় সংঘাত থেকে, যা আবার আমলাতন্ত্র ও জনগণের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক বিরোধ এবং খোদ "জনগণ" এর ভেতরে গভীরতর হতে থাকা বৈরিতার প্রতিফলন। বিচারগুলোর রক্তাক্ত "উদ্ভট" চরিত্রই দ্বান্দ্বিক বিরোধের তীব্রতার মাপকাঠি, এবং সেই সূত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে ঘনিয়ে আসছে, তার পূর্বাভাস।

ক্রেমলিনের সাবেক বিদেশি প্রতিনিধিরা, যারা মস্কোয় ফিরতে অস্বীকার করেছেন, তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য নিজেদের মতো করে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে আমলাতন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তার সব রং পাওয়া যায়: খাঁটি বলশেভিজম (ইগনাস রাইস) থেকে পুরোদস্তুর ফ্যাসিবাদ (এফ. বুতেঙ্কো) পর্যন্ত। আমলাতন্ত্রের ভেতরের বিপ্লবী উপাদানগুলো, যারা নিতান্ত ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, মজদুর শ্রেণির সমাজতান্ত্রিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করে, যদিও

নিষ্ক্রিয়ভাবে। ফ্যাসিবাদী, প্রতিবিপ্লবী উপাদানগুলো, যারা অবিরাম বাড়ছে, আরও বেশি ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ প্রকাশ করে। মুৎসুদ্দির [Comprador] ভূমিকার এই প্রার্থীরা মনে করে, এবং অকারণে নয়, যে নতুন শাসক স্তর তাদের সুবিধাভোগী অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে কেবল "পশ্চিম সভ্যতা", অর্থাৎ পুঁজিবাদকে আত্মস্থ করার নামে জাতীয়করণ, যৌথকরণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার, এই সকল বর্জনের মাধ্যমে। এই দুই মেরুর মাঝখানে রয়েছে মাঝামাঝি, ছড়ানো-ছিটানো মেনশেভিক-এসআর-উদারপন্থী প্রবণতা, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দিকে ঝাঁকে।

খোদ সেই তথাকথিত "শ্রেণিহীন" সমাজের সারির মধ্যেও নিঃসন্দেহে আমলাতন্ত্রের মতোই গোষ্ঠীবিভাজন রয়েছে, কেবল কম তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশিত এবং বিপরীত অনুপাতে: সচেতন পুঁজিবাদী প্রবণতা প্রধানত যৌথ খামারগুলোর [Kolkhozi] সম্বন্ধে অংশের বৈশিষ্ট্য, এবং তা জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর মধ্যেই সীমিত। কিন্তু এই স্তর সাধারণ দারিদ্র্যের বিনিময়ে ব্যক্তিগত সম্পদ জমানোর পেটি-বুর্জোয়া প্রবণতার জন্য এক বিস্তৃত ভিত্তি জোগায়, আর আমলাতন্ত্র সচেতনভাবে সেই প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়।

ক্রমবর্ধমান বৈরিতার এই ব্যবস্থার মাথায়, যা সামাজিক ভারসাম্যকে ক্রমেই আরও বেশি লঙ্ঘন করছে, থার্মিডোরীয় গোষ্ঠীতন্ত্র, যা আজ প্রধানত স্থালিনের বোনাপার্টবাদী চক্রে এসে ঠেকেছে, সন্ত্রাসের পদ্ধতিতে টিকে আছে। সাম্প্রতিক সাজানো বিচারগুলো ছিল বামপন্থার বিরুদ্ধে আঘাত। দক্ষিণপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের নির্মূল করার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য, কারণ পুরোনো বলশেভিক পার্টির দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্রের স্বার্থ ও প্রবণতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ছিল এক বামপন্থী বিপদ। বুতেঙ্কো ধরনের নিজের দক্ষিণপন্থী মিত্রদের ভয়েও ভীত বোনাপার্টবাদী চক্র যে আত্মরক্ষার স্বার্থে পুরোনো বলশেভিকদের প্রজন্মকে প্রায় শেষ মানুষটি পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হচ্ছে, তা জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রাণশক্তি এবং তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের অকাট্য সাক্ষ্য।

পশ্চিমের পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, যারা এই সেদিনও মস্কো বিচারগুলোকে খাঁটি সোনা বলে যাচাই করে দিয়েছিল, আজ জোর দিয়ে বারবার বলছে যে "সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রুটস্কিবাদও নেই, ট্রুটস্কিবাদীও নেই।" তবে তারা ব্যাখ্যা করে না, কেন সব শুদ্ধি অভিযান ঠিক এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকার নিচেই চালানো হয়। "ট্রুটস্কিবাদ" কে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি হিসেবে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি সংগঠন হিসেবে বিচার করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে সোভিয়েত ইউনিয়নে "ট্রুটস্কিবাদ" অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু তার অবিনাশী শক্তির উৎস এই যে, তা শুধু বিপ্লবী ঐতিহ্যকেই নয়, রুশ শ্রমিক শ্রেণির আজকের বাস্তব বিরোধিতাকেও প্রকাশ করে। আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জমে ওঠা সামাজিক ঘৃণা, ক্রেমলিন চক্রের দৃষ্টিতে ঠিক এটাই "ট্রুটস্কিবাদ"। শ্রমিকদের গভীর অথচ

অব্যক্ত ক্ষোভ আর চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সংগঠনের মধ্যে বন্ধনকে সে ভয় পায় মৃত্যুভয়ে, আর সে ভয় পুরোপুরি সংগত।

পুরোনো বলশেভিকদের প্রজন্ম এবং মধ্য ও তরুণ প্রজন্মের বিপ্লবী প্রতিনিধিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া রাজনৈতিক ভারসাম্যকে আরও বেশি করে আমলাতন্ত্রের দক্ষিণপন্থী, বুর্জোয়া অংশ এবং দেশজুড়ে তার মিত্রদের অনুকূলে হেলিয়ে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ দক্ষিণপন্থার কাছ থেকে, আসন্ন পর্বে আমরা আশা করতে পারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রকে সংশোধন করে তাকে ফ্যাসিবাদী রূপের "পশ্চিম সভ্যতা"-র ছাঁচের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ক্রমেই আরও দৃঢ় প্রচেষ্টা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা"-র প্রশ্ন জরুরি সুনির্দিষ্টতা পায়। যদি আগামীকাল বুর্জোয়া-ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী, বলা যায় "বুতেঙ্কোর উপদল", ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, তবে "রাইসের উপদল" অনিবার্যভাবে ব্যারিকেডের উল্টো দিকে অবস্থান নেবে। সাময়িকভাবে স্থালিনের মিত্র হয়ে পড়লেও তা রক্ষা করবে বোনাপার্টবাদী চক্রকে নয়, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক ভিত্তিকে, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত সম্পত্তিকে। "বুতেঙ্কোর উপদল" যদি হিটলারের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়, তবে "রাইসের উপদল" দেশের ভেতরে এবং বিশ্বমঞ্চে, উভয় ক্ষেত্রেই, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে। অন্য যেকোনো পথ হবে বিশ্বাসঘাতকতা।

এভাবে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবের প্রকাশ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে, কঠোরভাবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, আমলাতন্ত্রের থার্মিডোরীয় অংশের সঙ্গে "যুক্তফ্রন্ট"-এর সম্ভাবনাকে আগেভাগে অস্বীকার করা অনুচিত হলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য থেকে যায় সেই থার্মিডোরীয় আমলাতন্ত্রকেই উৎখাত করা। তার আধিপত্যের প্রতিটি বাড়তি দিন অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলোর ভিত পচাতে সাহায্য করে এবং পুঁজিবাদ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বাড়ায়। ঠিক এই দিকেই চলেছে কমিন্টার্ন, স্থালিনপন্থী চক্রের দালাল ও দোসর হিসেবে, স্পেনীয় বিপ্লবের স্বাসরোধ করে এবং আন্তর্জাতিক মজদুর শ্রেণির মনোবল ভেঙে দিয়ে।

ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর মতোই, আমলাতন্ত্রের প্রধান শক্তি তার নিজের মধ্যে নয়, বরং জনগণের মোহভঙ্গে, নতুন দিগন্তের অভাবে। ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর মতোই, যাদের থেকে স্থালিনের রাজনৈতিক যন্ত্র আরও লাগামছাড়া বর্বরতা ছাড়া আর কিছুতেই আলাদা নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ কেবল প্রস্তুতিমূলক প্রচারের কাজই সম্ভব। ফ্যাসিবাদী দেশগুলোর মতোই, সোভিয়েত শ্রমিকদের বিপ্লবী জাগরণের প্রেরণা সম্ভবত আসবে দেশের বাইরের ঘটনাবলি থেকে। বিশ্বমঞ্চে কমিন্টার্নের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আজ স্থালিনপন্থী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক লক্ষণ দেখে মনে হয়, কমিন্টার্নের পতন, যেহেতু জিপিইউ-র মধ্যে তার কোনো সরাসরি ভিত্তি নেই, বোনাপার্টবাদী চক্র এবং গোটা থার্মিডোরীয় আমলাতন্ত্রের পতনের আগেই ঘটবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের নতুন জোয়ার নিঃসন্দেহে শুরু হবে সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকার নিচে। *আমলাতন্ত্রের বিশেষ সুবিধা নিপাত যাক! স্থাখানভবাদ নিপাত যাক! সোভিয়েত অভিজাততন্ত্র আর তার খেতাব ও পদক নিপাত যাক! সব ধরনের শ্রমের জন্য মজুরিতে আরও বেশি সমতা চাই!*

ট্রেড ইউনিয়ন ও কারখানা কমিটির স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম বিকশিত হবে সোভিয়েত গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ ও বিকাশের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

আমলাতন্ত্র শ্রেণি-সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতের জায়গায় বসিয়েছে সর্বজনীন ভোটাধিকারের এক কল্পকাহিনি, হিটলার-গোয়েবলসের কায়দায়। সোভিয়েতকে শুধু তার স্বাধীন গণতান্ত্রিক রূপই নয়, তার শ্রেণিগত বিষয়বস্তুও ফিরিয়ে দিতে হবে। যেমন একসময় বুর্জোয়া আর কুলাকদের সোভিয়েতে ঢুকতে দেওয়া হতো না, তেমনি এখন আমলাতন্ত্র আর নতুন অভিজাতদের সোভিয়েত থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। সোভিয়েতে জায়গা আছে কেবল শ্রমিক, যৌথ খামারের সাধারণ সদস্য, কৃষক এবং লাল ফৌজের সৈনিকদের প্রতিনিধিদের জন্য।

সোভিয়েত পার্টিগুলোকে বৈধতা না দিয়ে সোভিয়েতের গণতন্ত্রীকরণ অসম্ভব। শ্রমিক ও কৃষকেরা নিজেরাই তাদের স্বাধীন ভোটে জানিয়ে দেবে কোন পার্টিগুলোকে তারা সোভিয়েত পার্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থে পরিকল্পিত অর্থনীতির আগাগোড়া পুনর্বিবেচনা চাই! উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের অধিকার কারখানা কমিটিগুলোকে ফিরিয়ে দিতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত ভোক্তা সমবায় পণ্যের মান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করবে।

যৌথ খামারগুলোকে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করো!

আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক নীতির জায়গায় আনতে হবে মজদুর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি। ক্রেমলিনের সম্পূর্ণ কূটনৈতিক পত্রালাপ প্রকাশ করতে হবে। *গোপন কূটনীতি নিপাত যাক!*

থার্মিডোরীয় আমলাতন্ত্রের সাজানো সব রাজনৈতিক বিচার পূর্ণ প্রকাশ্যতা, খোলামেলা বিতর্ক ও সততার আলোয় পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কেবল নিপীড়িত জনগণের বিজয়ী বিপ্লবী অভ্যুত্থানই সোভিয়েত শাসনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে তার অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে পারে। সোভিয়েত জনগণকে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম পার্টি একটিই- চতুর্থ আন্তর্জাতিকের পার্টি!

কাবিল-স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক গুন্ডাচক্র নিপাত যাক!

সোভিয়েত গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

সুবিধাবাদ ও নীতিহীন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

ফ্রান্সে লেওঁ ক্লমের পার্টির রাজনীতি আবারও প্রমাণ করছে যে সংস্কারবাদীরা ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক শিক্ষা থেকেও কিছুই শিখতে অক্ষম। ফরাসি সোশ্যাল ডেমোক্রেসি দাসের মতো জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেসির রাজনীতি নকল করছে, আর এগিয়ে যাচ্ছে একই পরিণতির দিকে। কয়েক দশকের মধ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে কার্যত তারই অংশ হয়ে উঠেছে, আর এখন তার সঙ্গেই পচে মরছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্কারবাদের পথ ধরেছে ঠিক এমন সময়ে, যখন পুঁজিবাদের সংকট মজদুর বিপ্লবকে নিশ্চিতভাবেই দিনের কর্মসূচিতে তুলে এনেছে। আজ স্পেন ও চীনে কমিন্টার্নের নীতি, অর্থাৎ "গণতান্ত্রিক" ও "জাতীয়" বুর্জোয়াদের সামনে মাথা নুইয়ে থাকার নীতি, দেখিয়ে দিচ্ছে যে কমিন্টার্নও আর নতুন কিছু শিখতে বা বদলাতে অক্ষম। যে আমলাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে, বিশ্বমঞ্চে সে কোনো বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারে না।

অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজমও মোটের ওপর একই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ফ্রান্সে লেওঁ জুয়োর সিন্ডিক্যালিস্ট আমলাতন্ত্র বহু আগেই শ্রমিক শ্রেণির ভেতরে বুর্জোয়াদের দালালে পরিণত হয়েছে। স্পেনে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজম তার লোকদেখানো বিপ্লবীপনা ঝেড়ে ফেলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রথে এক অকেজো বাড়তি চাকায় পরিণত হয়েছে।

লন্ডন ব্যুরোকে ঘিরে জড়ো হওয়া মাঝামাঝি অবস্থানের মধ্যপন্থী সংগঠনগুলো সোশ্যাল ডেমোক্রেসি বা কমিন্টার্নের "বাম" লেজুড় ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির আগামাথা বুঝতে এবং তা থেকে বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানতে তারা পুরোপুরি অক্ষমতা দেখিয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ রূপ ছিল স্পেনের পোউম (POUM), যা বিপ্লবী পরিস্থিতিতেও বিপ্লবী পথ অনুসরণে সম্পূর্ণ অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে।

দীর্ঘ বহু বছর ধরে বিশ্ব মজদুর শ্রেণির মর্মান্তিক পরাজয় প্রচলিত সংগঠনগুলোকে আরও গভীর রক্ষণশীলতায় ঠেলে দিয়েছে, আর একই সঙ্গে হতাশ পেটি-বুর্জোয়া "বিপ্লবী"দের পাঠিয়েছে "নতুন পথ" এর সন্ধানে। প্রতিক্রিয়া ও অবক্ষয়ের যুগে সবসময় যেমন হয়, চারদিক থেকে হাজির হয় হাতুড়ে আর ভণ্ডের দল, যারা বিপ্লবী চিন্তার গোটা

ধারাকেই সংশোধন করতে উদগ্রীব। অতীত থেকে শেখার বদলে তারা অতীতকে "বাতিল" করে দেয়। কেউ আবিষ্কার করে মার্কসবাদের অসংগতি, কেউ ঘোষণা করে বলশেভিজমের পতন। কেউ কেউ বিপ্লবী মতবাদের ঘাড়ে চাপায় সেইসব লোকের ভুল আর অপরাধের দায়, যারা ওই মতবাদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; আবার কেউ ওষুধকেই অভিসপ্ত করে, কারণ তা তাৎক্ষণিক ও অলৌকিক আরোগ্যের নিশ্চয়তা দেয় না। যারা আরেকটু বেশি দুঃসাহসী, তারা সর্বরোগহর ওষুদ আবিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়, আর সেই ওষুদ হাতে আসার অপেক্ষায় শ্রেণিসংগ্রাম থামিয়ে রাখার পরামর্শ দেয়। "নতুন নৈতিকতা"-র বহু প্রবক্তা নৈতিক হোমিওপ্যাথির সাহায্যে শ্রমিক আন্দোলনকে নবজীবন দেওয়ার তোড়জোড় করছেন। এই প্রচারকদের অধিকাংশ রণক্ষেত্রে পা রাখার আগেই নিজেরা নৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে বসে আছেন। এভাবে "নতুন পথ" এর মোড়কে মজদুর শ্রেণির সামনে হাজির করা হচ্ছে সেইসব পুরোনো টোটকা, যা বহু আগেই মার্কস-পূর্ব সমাজতন্ত্রের সংরক্ষণাগারে কবর পেয়েছে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক আপসহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, আমস্টারডাম ও অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট আন্তর্জাতিকের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাদের অনুগামী মধ্যপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে; সংস্কারহীন সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে; জিপিইউ-র সঙ্গে জোট বাঁধা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে; শান্তিহীন শান্তিবাদের বিরুদ্ধে; বুর্জোয়াদের সেবায় নিয়োজিত নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে; আর বিপ্লবকে যমের মতো ভয় পাওয়া "বিপ্লবী"-দের বিরুদ্ধে। এই সংগঠনগুলোর কোনোটিই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং অতীতের পচে যাওয়া অবশেষ। যুদ্ধ ও বিপ্লবের যুগ এদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক কোনো সর্বরোগহর ওষুদ খোঁজে না, বানায়ও না। সে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে মার্কসবাদের ওপর, কারণ মার্কসবাদই একমাত্র বিপ্লবী মতবাদ, যার সাহায্যে বাস্তবতাকে বোঝা যায়, পরাজয়ের পেছনের কারণ খুঁড়ে বের করা যায় এবং সচেতনভাবে বিজয়ের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। চতুর্থ আন্তর্জাতিক সেই বলশেভিজমের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেয়, যা প্রথম মজদুর শ্রেণিকে দেখিয়েছিল কীভাবে ক্ষমতা দখল করতে হয়। চতুর্থ আন্তর্জাতিক হাতুড়ে, ভণ্ড আর যেচে নীতিকথা শোনাতে আসা মাস্টারদের ঝঁটিয়ে বিদায় করে। শোষণের ওপর দাঁড়ানো সমাজে সর্বোচ্চ নৈতিকতা হলো সামাজিক বিপ্লবের নৈতিকতা। যে পদ্ধতি শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা, নিজেদের শক্তির ওপর তাদের আস্থা এবং সংগ্রামে আত্মত্যাগের প্রস্তুতি বাড়ায়, তা-ই ভালো পদ্ধতি। অগ্রহণযোগ্য সেইসব পদ্ধতি, যা নিপীড়িতদের মনে নিপীড়কদের প্রতি ভয় আর বশ্যতা গোঁথে দেয়, প্রতিবাদ ও ক্ষোভের মনোভাবকে পিষে মারে, কিংবা জনগণের ইচ্ছার জায়গায় বসায় নেতাদের ইচ্ছা, প্রত্যয়ের জায়গায় জবরদস্তি, আর বাস্তবতার বিশ্লেষণের জায়গায় গলাবাজি ও সাজানো অভিযোগ। এই কারণেই মার্কসবাদকে বিকিয়ে দেওয়া সোশ্যাল ডেমোক্রেসি এবং বলশেভিজমের ঠিক বিপরীত মেরু স্থালিনবাদ, উভয়েই মজদুর বিপ্লব ও তার নৈতিকতার প্রাণঘাতী শত্রু।

বাস্তবতার চোখে চোখ রাখা; সবচেয়ে সহজ পথ না খোঁজা; প্রতিটি জিনিসকে তার সঠিক নামে ডাকা; সত্য যত
তেতোই হোক, জনগণকে তা বলা; বাধাকে ভয় না পাওয়া; বড় বিষয়ের মতো ছোট বিষয়েও সৎ থাকা; নিজের
কর্মসূচিকে শ্রেণিসংগ্রামের যুক্তির ওপর দাঁড় করানো; কাজের সময় এলে সাহসী হওয়া: এগুলোই চতুর্থ
আন্তর্জাতিকের নিয়ম। সে দেখিয়েছে, শ্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে সে জানে। আসন্ন ঐতিহাসিক ঢেউ তাকে
তুলে নেবে নিজের চূড়ায়।

সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে

মজদুর শ্রেণির ঐতিহাসিক সংগঠনগুলোর বিশ্বাসঘাতকতার প্রভাবে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের আশপাশে কিছু সংকীর্ণতাবাদী মনোভাব ও নানা ধরনের গোষ্ঠী জন্ম নিচ্ছে, কিংবা পুরোনোগুলো নতুন করে মাথা তুলছে। এদের মূলে রয়েছে আংশিক ও অন্তর্বর্তীমূলক দাবির জন্য, অর্থাৎ মেহনতি জনগণের আজকের বাস্তব অবস্থায় তাদের প্রাথমিক স্বার্থ ও প্রয়োজনের জন্য, সংগ্রাম করতে অস্বীকৃতি। সংকীর্ণতাবাদীদের কাছে বিপ্লবের প্রস্তুতি মানে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিজেদের বোঝানো। তারা "পুরোনো" ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দিকে, অর্থাৎ কোটি কোটি সংগঠিত শ্রমিকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দেয়, যেন জনগণ বাস্তব শ্রেণিসংগ্রামের পরিস্থিতির বাইরে কোথাও বাস করতে পারে! সংস্কারবাদী সংগঠনগুলোর ভেতরের সংগ্রাম নিয়ে তারা উদাসীন থাকে, যেন জনগণের দৈনন্দিন লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ না করেই তাদের জয় করা যায়! বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর ফ্যাসিবাদের মধ্যে পার্থক্য টানতে তারা অস্বীকার করে, যেন জনগণ প্রতি পদে সেই পার্থক্য টের না পেয়ে পারে!

সংকীর্ণতাবাদীরা মাত্র দুটি রং চিনতে পারে: লাল আর কালো। নিজেদের যাতে প্রলোভনে পড়তে না হয়, সে জন্য তারা বাস্তবতাকে সরল করে ফেলে। স্পেনের লড়াইরত দুই শিবিরের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে রাজি নয়, এই যুক্তিতে যে দুই শিবিরেরই চরিত্র বুর্জোয়া। একই কারণে জাপান ও চীনের যুদ্ধে তারা "নিরপেক্ষতা" বজায় রাখা জরুরি মনে করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যকার নীতিগত পার্থক্য তারা অস্বীকার করে, এবং সোভিয়েত আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির অজুহাতে অক্টোবর বিপ্লবের সৃষ্ট সম্পত্তির নতুন রূপগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে অস্বীকার করে। জনগণের কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে না পেয়ে তারা উল্টো মহা উৎসাহে জনগণকেই দোষ দেয় যে তারা বিপ্লবী ভাবনার স্তরে উঠতে পারছে না।

এই বন্ধ্য রাজনীতিকদের সাধারণত অন্তর্বর্তীমূলক দাবির সেতুর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ওপারে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের নেই। তারা স্বেচ্ছা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, একই দীনহীন বিমূর্ত কথাগুলো বারবার আউড়ে তৃপ্ত থাকে। রাজনৈতিক ঘটনাবলি তাদের কাছে মন্তব্যের উপলক্ষ, কাজের নয়। সব ধরনের আনাড়ি আর ভেলকিবাজের মতোই সংকীর্ণতাবাদীরাও প্রতি পদে বাস্তবতার ধাক্কায় মুখ খুবড়ে পড়ে; তাই তারা চিরস্থায়ী বিরক্তির মধ্যে বাস করে, "শাসন" আর "পদ্ধতি" নিয়ে নালিশ করে, আর অবিরাম ছোটখাটো চক্রান্তে ডুবে থাকে। নিজেদের

চক্রের ভেতরে তারা সাধারণত স্বৈরাচার চালায়। সংকীর্ণতাবাদের রাজনৈতিক অসাড়তা ছায়ার মতো সুবিধাবাদের অসাড়তারই পরিপূরক; কোনোটিই কোনো বিপ্লবী দিগন্ত খুলে দেয় না। বাস্তব রাজনীতিতে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিবারই সংকীর্ণতাবাদীরা সুবিধাবাদীদের সঙ্গে, বিশেষত মধ্যপন্থীদের সঙ্গে, হাত মেলায়।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের টেবিল থেকে দৈবাৎ পড়ে যাওয়া উচ্ছিষ্টে পুষ্ট অধিকাংশ সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠী ও চক্র বিরাট দাবিদাওয়া নিয়ে "স্বাধীন" সাংগঠনিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, অথচ সাফল্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা তাদের নেই। বলশেভিক-লেনিনবাদীরা সময় নষ্ট না করে শান্তভাবে এই গোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজেদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেন। তবে সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা আমাদের নিজেদের সারিতেও আছে, এবং আলাদা আলাদা শাখার কাজে তা সর্বনাশা প্রভাব ফেলে। এদের সঙ্গে আর একদিনের জন্যও কোনো আপস করা অসম্ভব। ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্নে সঠিক নীতি চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সদস্যপদের মৌলিক শর্ত। যে জনগণের কাছে যাওয়ার পথ খোঁজে না, খুঁজে পায়ও না, সে যোদ্ধা নয়, পার্টির ঘাড়ে বোঝা মাত্র। কর্মসূচি রচিত হয় কোনো সম্পাদকমণ্ডলী বা আলোচনা-চক্রের নেতাদের জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য। সংকীর্ণতাবাদ ও শোধরানোর অযোগ্য সংকীর্ণতাবাদীদের হাত থেকে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের সারি পরিষ্কার করা বিপ্লবী সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত।

নারী শ্রমিকের জন্য পথ খুলে দাও! তরুণদের জন্য পথ খুলে দাও!

নিজের "নেতাদের" কারসাজিতে ঘটা স্পেনীয় বিপ্লবের পরাজয়, ফ্রান্সে গণফ্রন্টের লজ্জাজনক দেউলিয়াত্ব, আর মস্কোর বিচার-জালিয়াতির মুখোশ খুলে যাওয়া: এই তিনটি ঘটনা মিলে কমিউটার্ণকে এমন আঘাত হেনেছে, যা আর সারবার নয়, এবং প্রসঙ্গক্রমে তার মিত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্টদেরও গুরুতর জখম করেছে। এর মানে অবশ্য এই নয় যে এই সংগঠনগুলোর সদস্যরা তক্ষুনি চতুর্থ আন্তর্জাতিকের দিকে ঝুঁকবে। ভয়াবহ পরাজয়ের ধাক্কা খাওয়া পুরোনো প্রজন্ম উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আন্দোলন ছেড়ে যাবে। তা ছাড়া, চতুর্থ আন্তর্জাতিক নিশ্চয়ই একেজো হয়ে পড়া বিপ্লবী, মোহভঙ্গ আমলা আর ক্যারিয়ারবাদীদের আশ্রয়শিবির হয়ে উঠতে চায় না। উল্টো, পুরোনো সংগঠনগুলোর যন্ত্বে এখন যেসব পেটি-বুর্জোয়া উপাদান রাজত্ব করছে, তারা দলে দলে আমাদের পার্টিতে ঢুকে পড়তে পারে; এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন: যেসব প্রার্থী শ্রমিক নন, বিশেষত যারা সাবেক পার্টি-আমলা, তাদের জন্য দীর্ঘ শিক্ষানবিশকাল; প্রথম তিন বছর কোনো দায়িত্বশীল পদে বসতে না দেওয়া, ইত্যাদি। পুরোনো আন্তর্জাতিকগুলোর দগদগে ঘা যে ক্যারিয়ারবাদ, চতুর্থ আন্তর্জাতিকে তার কোনো জায়গা নেই, থাকবেও না। যারা আন্দোলনের ঘাড়ে চেপে নয়, আন্দোলনের জন্য বাঁচতে চায়, কেবল তারাই আমাদের কাছে প্রবেশাধিকার পাবে। বিপ্লবী শ্রমিকদের নিজেদের এখানে মালিক বলে অনুভব করা উচিত। তাদের জন্য আমাদের সংগঠনের দরজা হাট করে খোলা।

অবশ্য একসময় যেসব শ্রমিক সামনের সারিতে উঠে এসেছিল, তাদের মধ্যেও ক্লান্ত ও মোহভঙ্গ মানুষ কম নয়। অন্তত আসন্ন পর্বে তারা দর্শক হয়েই থাকবে। কোনো কর্মসূচি বা সংগঠন যখন জীর্ণ হয়ে যায়, তখন যে প্রজন্ম তাকে কাঁধে বয়ে বেড়িয়েছে, সেই প্রজন্মও তার সঙ্গে জীর্ণ হয়ে পড়ে। আন্দোলন নতুন প্রাণ পায় সেই তরুণদের হাতে, অতীতের দায় যাদের কাঁধে নেই। চতুর্থ আন্তর্জাতিক মজদুর শ্রেণির তরুণ প্রজন্মের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। তার সমস্ত নীতির লক্ষ্য তরুণদের মধ্যে নিজেদের শক্তি ও ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। কেবল তরুণদের তাজা উদ্দীপনা আর আক্রমণাত্মক মনোভাবই সংগ্রামের প্রাথমিক সাফল্যগুলো নিশ্চিত করতে পারে; আর কেবল এই সাফল্যগুলোই পুরোনো প্রজন্মের সেরা অংশকে আবার বিপ্লবের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। এমনই হয়েছে, এমনই হবে।

সুবিধাবাদী সংগঠনগুলো স্বভাবগুণেই প্রধান মনোযোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণির ওপরের স্তরে, আর তাই তারা তরুণ ও নারী শ্রমিক, দুই অংশকেই উপেক্ষা করে। অথচ পুঁজিবাদের অবক্ষয় সবচেয়ে ভারী আঘাত হানে নারীর ওপর, মজুরি-শ্রমিক হিসেবেও, গৃহিণী হিসেবেও। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের শাখাগুলোকে সমর্থনের ভিত্তি খুঁজতে হবে শ্রমিক শ্রেণির সবচেয়ে শোষিত স্তরগুলোর মধ্যে, অর্থাৎ নারী শ্রমিকদের মধ্যে। এখানেই তারা পাবে নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা আর আত্মত্যাগের প্রস্তুতির অফুরান ভাণ্ডার।

আমলাতন্ত্র আর ক্যারিয়ারবাদ নিপাত যাক! তরুণদের জন্য পথ খুলে দাও! নারী শ্রমিকের দিকে মুখ ফেরাও! চতুর্থ আন্তর্জাতিকের পতাকায় এই স্লোগানগুলোই জ্বলজ্বল করছে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিকের পতাকাতলে!

সংশয়বাদীরা প্রশ্ন তোলে: কিন্তু চতুর্থ আন্তর্জাতিক গড়ার সময় কি এসেছে? তারা বলে, "কৃত্রিমভাবে" কোনো আন্তর্জাতিক গড়া যায় না; তা জন্ম নিতে পারে কেবল মহান ঘটনাবলি থেকে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব আপত্তি কেবল এটুকুই দেখায় যে নতুন আন্তর্জাতিক গড়ার কাজে সংশয়বাদীরা অকেজো। আসলে তারা প্রায় কোনো কাজেরই নয়।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ইতিমধ্যেই মহান ঘটনাবলি থেকেই জন্ম নিয়েছে: ইতিহাসে মজদুর শ্রেণির সবচেয়ে বড় পরাজয়গুলো থেকে। এই পরাজয়ের কারণ খুঁজতে হবে পুরোনো নেতৃত্বের অধঃপতন আর বিশ্বাসঘাতকতায়। শ্রেণিসংগ্রাম কোনো বিরতি সহ্য করে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পথ ধরে তৃতীয় আন্তর্জাতিকও বিপ্লবের কাজে মৃত। *চতুর্থ আন্তর্জাতিক দীর্ঘজীবী হোক!*

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সময় কি এসেছে?... সংশয়বাদীরা থামে না। আমরা জবাব দিই: চতুর্থ আন্তর্জাতিককে "ঘোষণা" করার দরকার নেই। সে আছে, এবং সে লড়ছে। সে দুর্বল? হ্যাঁ, তার সারি এখনও বড় নয়, কারণ সে এখনও তরুণ। তার সদস্যরা এখনও প্রধানত ক্যাডার। কিন্তু এই ক্যাডাররাই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। এই ক্যাডারদের বাইরে এই গ্রহে সত্যিকার অর্থে বিপ্লবী নামের যোগ্য একটিও ধারা নেই। আমাদের আন্তর্জাতিক সংখ্যায় এখনও দুর্বল হলেও মতবাদে, কর্মসূচিতে, ঐতিহ্যে এবং তার ক্যাডারদের অতুলনীয় পোড়-খাওয়া দৃঢ়তায় সে শক্তিশালী। আজ যে এটা দেখতে পাচ্ছে না, সে আপাতত একপাশে সরে দাঁড়াক। কাল তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক আজই স্থালিনপন্থী, সোশ্যাল ডেমোক্রেট, বুর্জোয়া উদারপন্থী ও ফ্যাসিবাদীদের ঘৃণা কুড়িয়েছে, এবং সে ঘৃণা তার যথার্থ প্রাপ্য। কোনো গণফ্রন্টেই তার জায়গা নেই, থাকতেও পারে না। বুর্জোয়াদের আঁচলে বাঁধা সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সে আপসহীন লড়াই চালায়। তার কর্তব্য: পুঁজিবাদের আধিপত্যের অবসান। তার লক্ষ্য: সমাজতন্ত্র। তার পদ্ধতি: মজদুর বিপ্লব।

অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ছাড়া বিপ্লবী শিক্ষা হয় না। শৃঙ্খলা ছাড়া বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হয় না। চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ওপর দাঁড়িয়ে: আলোচনায় পূর্ণ স্বাধীনতা, কাজে সম্পূর্ণ ঐক্য।

মানবসংস্কৃতির বর্তমান সংকট আসলে মজদুর নেতৃত্বের সংকট। চতুর্থ আন্তর্জাতিকে ঐক্যবদ্ধ অগ্রসর শ্রমিকেরা তাদের শ্রেণিকে সংকট থেকে বেরোনোর পথ দেখাচ্ছে। তারা এমন এক কর্মসূচি হাজির করেছে, যা মুক্তির জন্য মজদুর শ্রেণি ও দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িতের সংগ্রামের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে। তারা তুলে ধরছে এক নিষ্কলঙ্ক পতাকা।

সব দেশের শ্রমিক নারী-পুরুষ, চতুর্থ আন্তর্জাতিকের পতাকাতলে সমবেত হও। এই পতাকা তোমাদের আসন্ন বিজয়ের পতাকা!